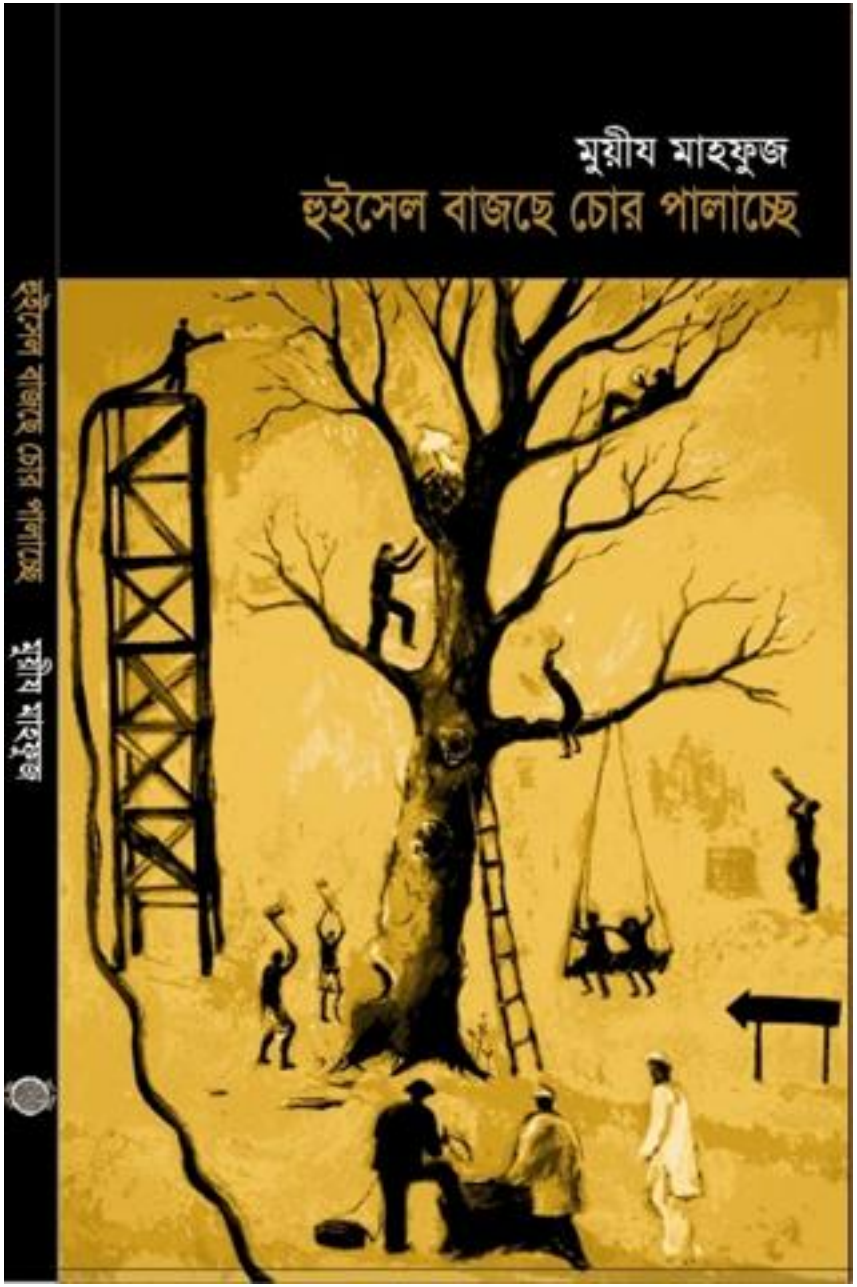

হুইসেল বাজছে চোর পালাচ্ছে

মুয়ীয মাহফুজ

হুইসেল বাজছে চোর পালাচ্ছে

মুয়ীয মাহফুজ

Whistle Bazche Chor Palachche

A collection of Bengali Poems

by **Muiz Mahfuz**

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

ফাল্গুন ১৪১৫

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

muiz_mahfuz@yahoo.com

প্রকাশক

সুমন প্রবাহন স্মরণ প্রয়াস

১৮৭/এ, (বি-২) নাইওরী, জমজ রোড,

জোয়ার সাহারা বাজার, বাড্ডা, ঢাকা ১২২৯

shoronproyash@yahoo.com

০১৭১৮-২৬৪৫০০, ০১৬৭২-৫৫২৬২৭

প্রচ্ছদ

শাওন আকন্দ

বর্ণ বিন্যাস

নক্‌শা, ৩১১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট

কাঁটাবন, ঢাকা ১০০০, ফোন: ০১৭১৬০৪৭৮৩৭

মুদ্রণ

দি ঢাকা প্রিন্টার্স

মূল্য

৭৫ টাকা

$ 5

ISBN : 984-300-003217-3

কৃতজ্ঞতা

অতনু হাবীব, অভিজিৎ দাস, শাওন আকন্দ, ফুয়াদ নাসের,

অনার্য তাপস, আব্দুল্লাহ্-আল-মাসুম, তসলিম মোস্তাফিজ, তামান্না

উৎসর্গ

মা

হামিদা আক্তার-কে

অনেক ভেবে ভেবে দেখতে পেয়েছি যে
'মা' শব্দটি কোন সম্বোধন হতে পারে না
'মা' শব্দটি মূলত বিশেষণ
যার জঠর যন্ত্রণার সময়ে একমাত্র
আমিই পাশে ছিলাম
আবার যার জীবন যন্ত্রণা ও মন্ত্রণার
মূল কারণও আমিই ছিলাম

নির্ঘুমপুরে পৌঁছে গিয়েও বারবার ফিরে আসতে হয়
আমার আঁতুরঘরে—আপাত পক্ষপাতময় এ সংঘাতের সমাজে।
শহরে, হলদে ল্যাম্পলাইটে—
অজস্র ডাস্টবিনের দৃষ্টি এড়িয়ে,
ভিখিরি ও পতিতার অনুরোধের মাঝে কী কী পার্থক্য আছে—
এইসব ভাবনাকে উপেক্ষা করে
খোলা মাঠে ছুটে পালাতে গিয়ে দেখি
ধারালো দূর্বায় কেটে গেছে হাত-পা।
আহা! এরকম আহত অবস্থায় নির্ঘুম থাকা যেতেই পারে, যায়!
অথচ এদিকে ক্ষীণ ধারায় ঝরে পড়া সূর্যরশ্মির কাছে হার মেনে যায় বোধ।
বল, কাকে তুমি নিসর্গ বলবে?

একটি সচল(!) সমগ্রের উপায়হীন নির্দেশে অসহায় হয়ে যাওয়া,
আদেশের খাঁচায় বন্দি এইসব
নন্দনের নীলিমা কতই বা সুবিশাল হতে পারে,
ভাবি—
নিশ্চল(!) বিশেষ ও সচল(!) সমগ্রের এই দ্বন্দ্বরূপ
অথবা মিত্ররূপ পাঠ করে যায় একটি অবিবৃত নৈসর্গ!

বিন্যাসক্রম

কালো তীর ছুটে আসে পিঠ বরাবর ◆ ৭
পৈতৃক যাযাবর ◆ ৮
তুমি বলবে কৈয়র আর আমি বলবো আখ,
এমনটা হবে না, কখনো ◆ ৯
বনমানুষ ◆ ১০
লিখে রাখি ◆ ১১
হুইসেল বাজছে চোর পালাচ্ছে ◆ ১২
স্রোত (ক) ◆ ১৩
হাটুরে, হাট ভেঙে দাও... ◆ ১৪
গর্ভবতী ◆ ১৫
রঙ দু'টি ধ্রুব হোক ◆ ১৬
সহজ সত্য ◆ ১৭
মনোক্ষণ ◆ ১৮
Euthanasia ◆ ১৯
আমি অগ্নিপূজারী ◆ ২০
বড়শি হাতে নার্সিসাসের এক
একটা দ্বিধাময় দিন ◆ ২১
সুধা যখন পানের অযোগ্য, তখন ◆ ২২
আগুন ◆ ২৩
নির্ঘুমপুরের পাহাড়চূড়োয় ◆ ২৪
দেবতার বাগান ◆ ২৬
খুনীর পুনর্বাসন,পলায়ন বা
তিনটি মৃত প্রাণী ◆ ২৭
ভুল ◆ ২৯
নির্ভাবনা ◆ ৩০
অনাগত বিচ্ছেদ মূলতঃ প্রেতভয় ◆ ৩১
তাণ্ডব ◆ ৩২
আরশি আমাকে ভাঙে ◆ ৩৩
চক্রান্ত ◆ ৩৪
আর যারা যারা কোলাহলপ্রিয় খুব,
তারা ধূলির মাদুরে বসে... ◆ ৩৫
বিকর্ষণ ◆ ৩৬
৩৭ ◆ ইন্টেলেকচুয়াল হাসির জন্য
কবিতা কৌতুক
৩৮ ◆ অন্ততঃ পৃষ্ঠা উল্টে গেলে কচ্ছপের
কথা মনে হয় না !
৩৯ ◆ আদিবাস
৪০ ◆ উত্তম পুরুষ
৪১ ◆ ইঞ্জেকশান অ্যান্ড প্যুশিং
৪২ ◆ গোলপাতার ছাউনি দেখে সভ্য মানুষরা
ভয় পেয়ে গিয়েছিল
৪৩ ◆ ভাল চেয়ে ভাল থাকা
৪৪ ◆ আততায়ী
৪৫ ◆ অসুস্থতা
৪৬ ◆ সাইকোপ্যাথ
৪৭ ◆ কান্না
৪৮ ◆ দীর্ঘসূত্রিতা
৪৯ ◆ তোমার নামে হাসব
একদিন, ঘনিষ্ঠ জানালায়
৫০ ◆ স্রোত (খ)
৫১ ◆ পাথরের আড়ালে সূর্যাস্ত লুকিয়ে আছে
৫২ ◆ একপাল মহিষ ও সূর্য, নিখাদ
৫৩ ◆ নির্জনতার মৃত্যু ঘটেছে ম্যানগ্রোভ
অরণ্যে
৫৪ ◆ খরা এবং বন্যা
৫৫ ◆ প্রতিধ্বনির প্রয়োগিক নিয়ম
৫৬ ◆ কেউ কি জানে, আমি কোথায়?
৫৭ ◆ কবি এবং তার গিটার
৫৯ ◆ অপেক্ষা
৬০ ◆ হাতের আড়ালে
৬০ ◆ গোলক
৬১ ◆ শব্দশর
৬৩ ◆ আলোরাত—আলো অন্তর্যামী
৬৪ ◆ তলানী দেখি, ফিরে যাবার কালে

কালো তীর ছুটে আসে পিঠ বরাবর

এমন বিশাল আয়োজন করে তোমরাই নিজে নিজে জয়ী হও!
হয়ত নির্জনে নিঃশেষ আমি ঘাসে ফেলে দিলাম শেষ মুদ্রাটিও
তোমরাই জেতো আমরাই হারি, এযুগ, ওযুগ, বারবার
একাই যাব তাই কোন অমাতীর্থে, কোন শুভ তিথি, রোববার।

হাত দিয়ে আজ নিভিয়ে মোমবাতি, যারা অভিজাত হল রাতারাতি
বাসায় ছিল হরিণের মাংস, গোয়াল ভরা হাতি
আনমনে আমার মা আজও ভাগ্য বুনে সংখ্যা গুনে।
মানুষ বলেই কি পুড়ছি, ছিঃ এক শ্যামল রিপুর ক্রন্দনে...

আমার প্রাণে লাগে এসে চতুর্দিকের ক্লান্তির এক হাওয়া
সূক্ষ্ম সাহস শামিল হল চোখে, তাকালাম যেই চারিপাশে
দেখি, পাহাড় তো নেই কোন, যেন সাগর শিথিল হওয়া।
তীর চলে যায়—যায় চলে তীর, এ কর্ণ দু'পাশ ঘেঁষে...

ভয় না পেয়ে, সুখ পেরিয়ে কোথায় যাব বল ?
তার চাইতে অশালীন কী আর? মৃত্যুজ্বরাই ভাল।

পৈতৃক যাযাবর

পিতামহ তুমি লুকিয়েছ কোথায়? উত্তরাধিকারী আমি
তোমার সমাধি খুঁড়ে হাড়গোড় নয়, মুকুট পেতে চাই!
উত্তাপে শুধু দুধ নয়, বিষ নিজেও ঘন হয়
তাই বুঝি মেঘের এমন মাত্রাবিহীন বজ্রপাত? নিখুঁত মাতৃছায়ায়
বিদ্যুৎ ছাড়ে না তোমাকেও! প্রতিটি সমাধি খুঁড়ে তাই
মেঘদূত পোড়াবেই মুকুট—গলিত সমাধি ফলক তাই বলে।
ছাড়ে না মৃত্যু, ছাড়ে না জীবন কেউ কাউকে ছাড়ে না।
স্বেচ্ছায় চাইছি অভিশাপ, কারাগার, গুপ্ত দরজার চাবি
যে দরজায় প্রহরী নেই, মুণ্ডুতে ঝুলে থাকে ফাঁসি...

উল্লাস ভালবাসি তাই পিতার মৃত্যুতে কি আসে যায়?
যে মৃত্যু আমাকে করেছে প্রাপক—বিষয়ে করেছে বিষয়ী!
তর্জনীতে বল চাইছি, অনুতাপ নয় তাপ চাইছি।
উত্তাপে শুধু দুধ নয়, বিষ নিজেও ঘন হয়...

সমাধি খুঁড়ে দেখি শুধু হাড়গোড়! হায় আমার নিঃস্ব পূর্বসূরি!

চুলের মুকুট লাগিয়ে মাথায়, করোটির হঠাৎ ভয় হয়।

তুমি বলবে কৈয়র আর আমি বলবো আখ, এমনটা হবে না, কখনো

বাংলার কৃষক, তোমাকে বিয়ে করবো, দিগন্তব্যাপী সবুজ সমুদ্রে নৌকায় ভেসে ভেসে
তোমার সঙ্গে চলে যাব আজ, সহস্র কৃষক ময়ূরের দেশে
তোমার ট্রাক্টরে যে সকল যান্ত্রিক ত্রুটি, সে অসুখ মাথায় আমার
পাথরে ছিটিয়ে রাসায়নিক সার, গোলাপী পাড়ের শাড়ি ধরব এবার
তোমার পায়ের সামনে ফড়িঙেরা যে মুক্তা নামিয়েছে ধীরে
সেইসব মুক্তাজলের মালা গেঁথে দিও কিন্তু আমার শরীরে,
যখন মাটির ঘরে আমি, অস্থির ধানছড়া হাতে তোমার, তখন তুমি ক্ষেতে
মৃৎমেঝেতে চিঠি লিখব ধানগ্রন্থ দেখে আমি—নকশিকাঁথা বুনে যেতে যেতে...
ফিরে এলে পর তোমার বাহু জড়িয়ে ধরে বলব, 'ফলটা পেড়ে দাও না গো'
তুমি আমার গাছে চড়বে, আমি তোমারটাতে—আমরা খুশি হব
পুরুষ অথবা নারীদেহ যা-ই হোক ফলের পরিণতি—আমাদের কুটির প্রাসাদ
হবে, ঘরেতে যেহেতু অনেক চড়াই থাকবে বিশ্বাসে, বলবে, আশ্রয়দাত্রীর নেই কোন রাত,
ছত্র ফেলে দিয়ে মনে ছত্রাক রাখো নি চাষি, তুমি পুড়বে সূর্য-রোদে, তোমার ছায়ায়
পুড়বো আমি—খেয়াল রেখো, তোমার জমির আল কেটে কেউ যেন জল না নিয়ে যায়
আমাদের ছেলে কিন্তু স্কুলে যাবে না, রাখাল হবে আর গাভীটির দুধ দোয়াবো আমি
এদিকে খড় চুরি করা কাঙালের সঙ্গে ঝগড়া করবে আমার স্বামী
যে বছর ফসল আসবে না গোলায় একদম—মন খারাপ হবে না গো প্রকৃত চাষি
গর্ভজাত ফলগুলো দ্বিভাজিত করে তখন আমি সন্তান দেব, একটি নয়, দু'টি নয়, রাশি রাশি
তোমার তামুক ফুরিয়ে গেলে পর সাধনার গাজনে সাজিয়ে দেব হুক্কা
হাঁসেরা দেখুক সুখী পরিবার, ছেলে যাবে লাঙল নিয়ে, মেয়েরা খেলবে এক্কা-দোক্কা...

বনমানুষ

হলদে ল্যাম্পলাইট, তুই নিভে যা রে, তুই নিভে যা
হা হা করে শিক্ষিত জ্যোৎস্না তেড়ে আসুক

এক প্রকার মিতব্যয়ী তমোপ্রাণ—শরীরের এই লুকোনো ঘ্রাণে
যেন জড়িয়ে রেখেছে ভুল নগরের বালকেরা
যারা শুধু জানে আলাদিনের প্রদীপের আলো,
ওরা তো ট্যাপ থেকে নিঃসরিত জলপ্রপাতের শব্দে জুড়োয় কান
তাদেরকে আমি অরণ্যের চিত্র দেখাব বলে তাই
একবার বনমানুষ সেজে ঘরে গিয়েছিলাম।
—এখনো তাদের কাছে বন্য—বনমানুষই রয়ে গেছি!

এখনো ঘাসে ঘাসে লুকিয়ে আছে স্কাল্পহান্টারেরা।
গৃহদেয়ালে মানিপ্ল্যান্ট গাছ অপরিহার্য তাই
শখ, শখজাত সৌন্দর্যবর্ধিতা অন্তত ওটা নয়,
অন্য প্রয়োজন আছে...

মহাসত্যগুলো জানে যারা তারাই সম্মোহিত পাপী এমন!
ঊনমন, বরং তুমি এক কখনো যোগ কোরো না।

লিখে রাখি

তোমাদের কাছে আমার কত ঋণ হল? লিখে রাখ;

আমি আমার আত্মাবিহীন দেহ দেখে দেখে কেন লিখে গেছি
ফলের ভেতরের শাঁস নয়, বীজ আমাকে টানে এই কথা।
কোন এক শয়তানকে না দেখেই বলেছি
আয়, আমার শত্রু হোস না তুই, ভালবাসা নে
এই কথা লিখে গেছি।

তোমার অবর্তমানে আমার ঘরে আমিই আছি,
অন্য কোথাও নয়, তবুও আমার ঘরে আমিই ফিরে ফিরে
দেয়ালের ইটের পোড়া ঠিক পরিমাণ হয়েছে কিনা যাচাই করি,
বজ্রবিহীন আকাশ কারো কারো জন্য নিরাপদ, তবু আমার জন্য নয়।
বেসিনের মাঝে জল আটকে রাখি,
বেসিনের মাঝের জল ছেড়ে দেই,
নিষ্কাশনের শেষ ধাপে গোল্ডফিশটিও জেনে ফেলেছে যে
সে আসলে জলের কোন অংশ নয়।
অধিক বিশুদ্ধ বায়ু কারো কারো মৃত্যু নিয়ে আসে।
তবুও প্রবাহের দিকে নয়, ঢাল ভালবেসে পতন টেনে নিয়ে
যায় জলের স্বচ্ছতা, রেখে যায় মীনদেহ, আড়চোখে অসাড়তা
—এই কথা লিখে রাখি।

তন্ময় সরণি বেঁকে গিয়ে
বন্ধুর দরজায় নিয়ে যায় আমাকে। অনাগ্রহী এ বিষয়ে আমি
তবু এই কথা লিখে রাখি।

হুইসেল বাজছে চোর পালাচ্ছে

রাত্রির প্রাসাদে প্রহরী বাজায় হুইসেল—
শেষ প্রহরে আমি তাই লুকিয়ে লুকিয়ে আড়াল খুঁজি,
যেন এক চোর; মিথ্যার আড়ালে জালিয়াত এক
তোমার অজান্তেই দেখে নিই প্রজাপতি খাতা!

মৃত প্রজাপতি বুঝি রঙিন হয় আরও,
সময় ধরে রাখে, অসময়ে স্মৃতির দুপুর ?
প্রজাতির ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা কি একজন নয়
যে জনের কারণে জনান্তিকে তুমি হয়েছ লীন!

পাথর ছুঁড়ে মারো, দুঃখে ঘিরে থাকো
বসে থাকা ঝোপগুলো প্রজাপতিসমেত
পালিয়ে যাবে তবে—তিরোধান চাই আমি,
চাই প্রাণরূপ, সংগ্রহের ভাঁজে ভাঁজে...

তুমিও কি তাই ভেবেছিলে ? নাকি হোঁচট খেয়েছিলে,
জানালা ছেড়ে পালিয়ে গেল ওরা; দেখোনি কি কাল?

স্রোত (ক)

কখনও হইনি অচেতন, জেগে আছি বহু বছরের ঘুম বিসর্জন দিয়ে
সমস্ত ঘুম উড়ে গেছে বিভিন্ন রোদের উত্তাপে
আমার শয়নভঙ্গির অনাচারে সবুজ ঘাস হয়েছে হলুদ
তবুও জানি আত্মমেহন নয় এ কারো রূপে গুণমুগ্ধতা নয় ।
স্রেফ সদর্থক জীবনের স্রোত ।
স্রোত হল চলমান জলে থমকে থাকা পৃথিবীর রোদ ।
এইসব ক্লান্তিতে নিরাময় নিয়ে এসো উত্তরের ঝড়, প্লিজ ।
নিরাসক্ত ফুল কিংবা আসক্ত কীটের জীবন
আসলে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের মত সমান কাব্যিক ।

অ্যাম্বুলেন্স ক্লান্ত হয়ে হাসপাতালের কাছে গিয়ে নতজানু হয় ।
ভেতরে অসুখ, ভেতরে আসুরিক রোগ নিয়ে দৌড়ে চলা,
অতঃপর সেবিকার শুভ্রতা, চার্টশীট আর একদিন
জরুরী যানবাহন হেডলাইট জ্বেলে বলবে,
তোমার আর একটা পিঁপড়ার ক্লান্তির ভঙ্গিমায়
কোনই পার্থক্য দেখি না কখনোই ।
আমার ক্লান্তিও আরব্য রজনীর বোতলের দৈত্যের মত করে
মুক্তি পেয়ে গিয়েছে,
সরু ছিপি খুলে যায়, কোন আদম সন্তানের ভুলের মাশুল
এবং শেষমেশ ভয়ের বিলুপ্তি ও অভাব উত্থাপন করা ।

ক্লান্তিরা তবুও লিপ্সার বুদ্‌বুদে বন্দি থাকে, অক্লান্ত অবসর নিয়ে ।

হাটুরে, হাট ভেঙে দাও...

হাটুরে,
বিকলাঙ্গ মেয়েটিকে এমন বরফের দিনে ফুলের আশ্বাস দিয়েছিলাম;
ফুলের জলসা পেলাম না,
অথচ দেখেছি শুধু কামারের দোকান
ছুরি কিনে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি!

একটি সম্পূর্ণ সাষ্ঠাঙ্গের মূর্তি নেব বলেই এসেছিলাম;
কুমোরের ঝাঁপি খুঁজে পাই নি
তাই দুই আনা পয়সা ধূলোয় খুঁড়েছি!

বাউলের সূক্ষ্ম গান কণ্ঠস্থ করব ভেবেছিলাম;
গায়েন গোপনে শুনছে গৃহস্থের গরাদ
আর একতারাটি তার নিজস্ব লাউভর্তি ধারালো সুর নিয়ে
অভিমানে যেন অডিও ক্যাসেটে হৃদয় বাজাচ্ছে ।

পেয়েছি কোলাহল-দরদাম; মাছের কানকোর মত লাল!

বিকলাঙ্গ মেয়েটি আমার হাত ধরে দাঁড়াতে চায় কিছুক্ষণ
অথচ মুঠোয় আমার সোনালী ধূলো, ছুরি এবং মুখরা তর্জনী

কেউ আমার কান ম'লে দাও—আমার হাত আছে তবু নেই!
হাত নেই কোনো! আমি পঙ্গু! আমিই তো পঙ্গু...

কিছু নেই প্রায়
হাটুরে, হাট ভেঙে দাও...

গর্ভবতী

অনেকদিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ না তুমি ।
ভেতরে জল, বাহিরে জল, তার ভেতরে তুমি
অদৃশ্য হয়ে গেছ জলের রঙ ধারণ করে!
বাহির থেকে কেবল তোমার ভেতরকার
ক্রমবর্ধিষ্ণু এক মুক্তা করে ঝলমল
পৃথিবীর বিপরীতে তোমার কামুক স্বামীটি
আর ঘুম থেকে হঠাৎ জাগায় না তোমায়
অস্বস্তি নিয়ে তোমার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রত্যঙ্গটির
সৌন্দর্য অনুভব করে স্পর্শ দিয়ে...
আরো সুন্দর হয়ে যাচ্ছ তুমি
হয়ে যাচ্ছ আরো একা...

আমি জানি, তোমার এই সৌন্দর্য নিয়ে তুমি বিব্রত হও ।
কেবলই ভাবো অস্বস্তির অন্তরালে যে দৃষ্টি
আছে তা বুঝি বেশী অন্তর্ভেদী...

বৃষ্টিতে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে মন
শূকর আর হরিণ একই সাথে খেলা করে,
একই জানালায়!

চলনা, বেড়িয়ে আসি ।

রঙ দু'টি ধ্রুব হোক

চেয়ারে এখনো বসে আছে অন্ধকার, খাটে শুয়ে আছে একপ্রস্থ আলো
অথচ কোথায় বসব আমি? কোন সাধনার শবাসনে নয়
আসলে বসে আছি ঘাসে—তৃণভোজী শুধু নিরীহ পশুরাই হয়
তবু হরিৎসেবীরা স্পর্শ নেয় হাতে; কোমল হলেও আজও
তাদেরকে মনে মনে আমরা অসুস্থ বলি—তাই উঠে যাচ্ছি...

কেন যে জানালা বন্ধ রাখো? তার পাশেই কতগুলো জলচিত্র
দেয়ালে ঝুলিয়ে ভাবছ তুলনামূলক ভাল লাগছে সেই খণ্ডদৃশ্য!
তোমার ভাবনায় ক্ষুদ্র বনসাই আজ তার নিজস্ব অহমিকায়,
তোমার কোমরে প্যান্টটি লাগাতে একটা বেল্টের প্রয়োজন হয়,
তোমার কুটির প্রাসাদ আজ—কেননা একটা চড়ুই বেঁধেছে তার নীড় ।

আমি তো হাতে নির্দোষ ইক্ষু নিয়েও পরিজনের কাছে শুনেছি
মানুষের বাহুর চাইতে দীর্ঘ সকল বস্তুই নাকি মারণাস্ত্র!
এমন কী সামাজিক গান কণ্ঠস্থ হলেও আমার মনে থাকে না সুর!
নতুন করে কি আমি এ-ই বিশ্বাস করব? শেখা বাকি সেই মন্ত্র:
শেষ রাতে কুকুরের স্বাগত ধ্বনিতে যারা ঘরে ফেরে তারাই মহান লোক!

বর্ণান্ধ বোনটিকে রঙের বাক্স দিয়ে দেখি শুধু সাদা ও কালো
চোখে তার বসে আছে বর্ণচোরা ব্ল্যাকহোল; সব গভীরতা ছুঁয়ে যাচ্ছে দ্রুত...
পৃথিবীর সব রঙ উঠে গেলে পিঠে রোদ, সামনে ছায়া—রঙ দু'টি ধ্রুব হোক ।

সহজ সত্য

রাত্রির শিশিরটুকু ধানপত্র থেকে শুকিয়ে গেলে, রোদের অভিপ্রায়ে,
আমার ঘুমটুকু তেমনি শুকিয়ে গেছে রোদের বিছানায় ।
কে যেন আমাকে তীর ভেবে ছুঁড়ে দিলো দৃশ্যের লক্ষ্যবিন্দুতে
রোদে কালো হয়ে যাওয়া আংশিক পাপ হবে ভেবে
গাছের শেকড়ে তাই জেগে থাকি, রাত্রিতে ভীষণ,
গভীর রাত্রিতে সকালকে জাগাই
সকাল-
দূরের গাছগুলোর সবুজ খামে কোন চিঠি, কোন গ্রাম আঁকা আছে কে জানে?
আমার ছায়ায় শিশির, ছায়া ভেসে আছে জলে
জলছায়া, তুমি কোথাকার শরীর ছিঁড়ে নাও?
তোমাতে প্রজাপতিরা ডানা নামিয়ে অদ্ভুত দূরত্ব সৃষ্টি করেছে?
আমি আমার কাছ থেকে দূরে বসে থাকি, ছায়ার মত দূরত্বে...
ফুলের কিরণ আমি চোখে ঘষি তবু বুঝতে পারি
আমার প্রিয় গানগুলো অন্য সুরে, অন্য ভাবে গাইছে কেউ,
এই পোড়ো জমিতে সেই মৃত বাতাস এখনও আসছে ভেসে...
ফসলের ক্ষেতের উর্দ্ধে, নভোমুখে, সাত ফুট দূরত্বে বিদ্যুতের তারে বসেছিল
নির্বোধ শালিক পক্ষিরা, বেজোড় সংখ্যক ফিরে যাচ্ছ তুমি,
আজই এইসব দৃশ্য ছেড়ে, নগর বন্দনায়
পরিবারের সকাশে মুহুর্মুহু গাইছ সামাজিক গান
অসামাজিক আমি মুখে বিদঘুটে গন্ধ, বিষের গন্ধ ঘিরে থাকে;
সাত পাক ঘিরে থাকে আমাকে, সাত সমুদ্র পার হতে পারি না ।

মনোক্ষণ

একটি ঘরের ঢালু ছাউনিতে গড়িয়ে নামছিল রোদ
সেই ঘরের টিনের ছাউনির মাঝে কিছু ছিদ্র
খাটে বসে ফোঁটা ফোঁটা রোদ পান করছে লোকটা
মস্তিষ্কে তার এক বেসামাল আনন্দ
অথচ ভাতের হাড়িতে ভাতের আলো নেই কোন
হাড়ি ভর্তি অন্ধকার চুলোয় পুড়ছে টগবগ...
আর পোড়ামাটির ব্যাংকটি ভাঙতেই
মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল
পরাজিত পয়সার পরাক্রান্ত বাদুড়!

বাজারের দোকানের ছাদের সিমেন্ট কিছুটা ভাঙা
সেখানে শোনা যায় টিকটিকির স্বর;
পৃথিবীতে নাকি তার শেষ হয়ে গেছে মুগ্ধতার চৌদ্দ বছর...
বেঞ্চে বসে এক কাপ ঠাণ্ডা চায়ের বিরক্তি পান করছে লোকটা
মস্তিষ্কে তার বেসামাল এক বিশ্বাস
অথচ দেয়ালের সেই মানিপ্ল্যান্ট শুকিয়ে গেছে;
সেখান থেকে বিশুষ্ক অর্থ ঝরছে টুপটাপ...
আর প্রকৃত ব্যাংক চেকটি ভাঙাতেই;
কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল
ওই সংসারের গৃহত্যাগী বুলেট
নারী প্রাণ, অজস্র ধার করা সংশয়...

Euthanasia

আশ্চর্য!
একটি সরব আড্ডাখানার খুব কাছাকাছি এসেও নীরবে চলে গেলে!
তোমার পোকায় ধরা দাঁত দিয়ে সাবঅলটার্ণ আঙুল হতে শুষে নিলে লাল বিপ্লব!
তোমার নাম আমি কনিষ্ঠ প্রতিভা রাখতে চেয়েছি।
যে তুমি দেয়াল থেকে আনমনে খুঁটে ছিঁড়ে ফেল সবুজ শ্যাওলা
যার কাছে গুঞ্জন মানে দাবির প্রকাশ!

এখনও সেইসব আধুনিক চিন্তাকাঠামোতে আশ্রয় খুঁজে পাও চড়ুই পাখির মতন!
যা কিনা প্রকৃতির কল্পিত সাম্যাবস্থা নির্ভর,
সেইসব ধূসর মানচিত্র
কীভাবে যেন চলে এল মানব জীবনে...

অথচ সকল সাম্যের খুব কাছাকাছি এসেও, আপাত জৈবিকতায়
অথবা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায়... একজনই কেবল প্রত্যক্ষ ভূমিকায়!
তুমিও মেনে নিয়েছিলে তা! এমত সীমাবদ্ধতার পরও আমি আমার
ভূমিকায় নিষ্ক্রিয় আছি দেখে দেখে তুমি কেন পাপবোধ কর?

ইদানিং আমি আর কোন মেনিফেস্টো পড়ে দেখি না,
অজস্র মেনিফেস্টোর ঘুড়িরা ধারালো মাঞ্জায়
সুসজ্জিত হয়ে
করছে কাটাকাটি... অজস্র চিৎকার... ভোকাট্টা... ভোকাট্টা...
শোনা যায় অবিকল দাবির মত করে।
প্রগতির অতি বিচ্ছিন্ন সুরে গভীর ভাবে কান পাতলে
শুনতে পাবে ইউথানেশিয়া ডাকছে।
ডাকছে তোমাকে...
না, তুমি শুনতে পাবে না,
কারণ ইদানিং আমি আর কান পেতে পেতে দাবির শব্দ শুনি না।

তবুও তোমাকে আমার দরকার,
আমার কৃপাহত্যার সহযোগি হিসেবে।

আমি অগ্নিপূজারী

একবার আরোগ্য কামনা করি নিজের আগুনের কাছে
দেবতা আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয় নি কখনো!
আমি অগ্নিপূজারী! তাই প্রার্থনা ভেবেচিন্তে করতে হয়।
কিন্তু আরাধ্য এ আগুন এমন শীতল যে অগ্নিদেব
পর্যন্ত জমাট বরফ হয়ে গেছে...

আরো ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি,
জাগরণ স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে...দেখি
শিকারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া আহত বন্য পাখি
আমার হাতের মুঠোয় চিৎকার করছে খুব।
আঙুল ঠুকরে রক্ত চুষে নিলো সে,
যেন স্তন্যপায়ী হতে চেয়ে রক্তেই পেয়েছে দুধের বিকল্প রঙ।
বুঝে উঠতে পারি না স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন
কীভাবে নিজ নিজ স্থানে হতে পারে সমান বর্ণিল!

ইদানিং একদল কাগুজে সৈন্য বিষাক্ত অক্ষরে
ভরা সুখী দুঃখী অতীত নিয়ে আসে হিমায়িত কোষ থেকে,
অতঃপর এই অভিজ্ঞতা আমি তাদের পুড়িয়ে ফেলতে বলি;
এই হলুদ স্বপ্নগুলোকে তারা নিতান্ত অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগুনে।
নিশ্চিন্ত অনুভব করি,
যদিও শীতল আগুনে দহে না কিছুই!

বড়শি হাতে নার্সিসাসের এক একটা দ্বিধাময় দিন

যেখানেই জলের অবস্থান, সেখানে ফাঁদ পেতে আছে আমার প্রতিচ্ছবি,
অগভীর অথবা অনন্ত গভীরতা যা-ই হোক না কেন
জলের পারদে আমার ভেসে থাকা রূপ কেন যে পৃথিবী ধারণ করে!
অপর কিংবা অপরাপর বোধে সম্পৃক্ত থেকে যায় আমাদের রূপ,
প্রতিচ্ছবি আমার ব্যক্তিগত জগৎ জাগ্রত করে,
আমাকে আরো বিচ্ছিন্নপ্রেমে আচ্ছন্ন করে।

জ্যামিতি বক্স থেকে আমার কৌণিক দূরত্ব মধু মাখা বৃষ্টির মতই।
জ্যামিতি বক্সে ভরে রেখে রকমারি টোপ!
বড়শিতে গেঁথে নিয়ে দানবিক ক্ষুধা,
জলের উপরিতলে যখনই চালাই দৃষ্টি,
দু-একটি হাঙর লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে গিলে নেয় রূপালী রোদ্দুর!
অতঃপর তারা ফের ডুবে যায় নিজেরই জলজ ছায়ায়।

কারা যেন ফিসফাস করে ওঠে:
নীরব থাক, মেঘশৈলী লক্ষ্য কর।
তবেই তোমার চোখ এড়িয়ে যাবে নিম্নগামী জল ও জলের পোর্ট্রেট থেকে।

কোন এক গো-চারণ ভূমিতে এক বাঘের ঘোরাফেরা রয়েছে,
কোন এক পাহাড়ী উপত্যকায় হ্রদ রয়ে গেছে সিংহের চাতুর্যে,
কোন এক উপবনে অজস্র ম্যামথের দল দ্যাখে একটি দাবানল, আগ্রাসন।
সকলেরই রয়েছে দৃষ্টি কোন না কোন এক দিকভ্রান্তির পোশাকসমৃদ্ধ গন্তব্যে,
আপাত প্রতারণাময়...

পার্সপেক্টিভস, রঙের ব্যবহার কিংবা অঙ্কনশৈলী
সব কিছুতে নিখুঁত শিল্পী হয়েছিল জল,
তবুও পোর্ট্রেট পছন্দ হয় না আমার...
রৌদ্রসংক্রান্তির ফলে যে ছবি মেয়াদউত্তীর্ণ,
তাকে ফেলে দিয়েই ছিপ কাঁধে পথ ধরি, ফিরি।
প্রতিদিন যেভাবে ফিরতে হয় সন্ধ্যাবেলায়।

সুধা যখন পানের অযোগ্য, তখন

তোমার চোখে ডুবছে বাঁকা চাঁদ
শন্‌শন্ করে বইছে বাতাস বইছে সারারাত,
বিষের থালায় একটি মাছি ভাসছে, শুধু ভাসছে
জীবন কষ্টে আমার হৃদয় যেন খুব করে তাই কাঁদছে ...

তোমার হাতের রেখায় কাদের জীবন আঁকা
আমার হাতে পত্র ওড়াই, সবুজ ঘাসে ঢাকা
উড়ছে পাখি, উড়ছে উড়ুক, সারা আকাশ জুড়ে
হঠাৎ যদি রোদের বৃষ্টি বেরোয় রাত্রি ফুঁড়ে।

মেঘের ছোঁয়া লাগুক, লাজুক তোমার চোখে
দেখবো ছুঁয়ে কেমন লাগে কালনাগিনীর ঠোঁটে,
অনল গরল ঢালছি গলায়—কেমন যেন লাগছে!
দেখি, বিষের থালায় একটি মাছি ভাসছে, শুধু ভাসছে।

আগুন

ভালবেসেও কোন অনুভূতি হয় নি বলে হাতের
চামড়া পুড়িয়ে দু'টি গর্ত সৃষ্টি করি
অতিরিক্ত এসব চোরা চোখে বিস্ময়ের রক্ত নেই!

—এইসব স্থূল বেদনার পর যদি ভালবাসা ফিরে আসে?
অপেক্ষায় আছি আমি,
দুঃখবাদী নন্দনের ঘ্রাণে বিভোর।

কোন কোন মৃত সক্রেটিসও জেনেছিল
'বেদনাই সৃষ্টির উৎস্য'

অথচ এত ক্রমবর্ধিষ্ণু জনপদ রাস্তায় হেঁটে হেঁটে
কেন পোড়াচ্ছে পাদুকা? ভুল-ভাল হচ্ছে জেনেও
মনোযোগী হও তীর্যক জীবিকায়! সকলেই জেনেছে উপকারী
বার্তা এই যে;
হৃদয় আর মনের কথা শুনে লাভ নেই, ক্ষতি আছে।
তাছাড়া এরা নিজের ইচ্ছায় নিজেরাই বন্দি থাকে
চামড়ার ভেতর।

এদিকে আমার অগ্নিকুণ্ড নিভে আসে,
চারিপাশে বেদনাবিহীন ধোঁয়ার বিস্তার ঘনায়
চামড়া পোড়ার গন্ধ ভেসে আসে নাকে।

নির্ঘুমপুরের পাহাড়চূড়োয়

এই যে এইসব প্রাচীন দেয়াল অথবা শ্যাওলাধরা আগ্রাসন,
আমি কাকে দেখব তুমিই বল হে পাতক;

শতশত মৃত্যু দেখি আর জন্ম দেখতে পাই কাছে;
ছিঁড়ে ফেলি পুরোনো লেখা, দান করে দেই যেমন পুরানো কাঁথা-বালিশ
তেমন করে কাউকে নয়;
সেবক যখন লিখছে নিজের কথার ব্যতিক্রম
তখন যা আসে তা ঘুম নয়, তন্দ্রাতমসার মাঝে হঠাৎ মুদ্রাপতন।

সবাইকে ঘুম পাড়িয়েছি খুব স্নেহ, মমতায়,
শুনিয়েছি সংগীত, ভাবিয়েছি গল্পে,
শেষমেষ ক্লান্তির কোলবালিশে এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।
এবার কি আমার পালা?
আমাকে কে নিদ্রা এনে দেবে?
সারারাত জেগে খুব সকালে
পদ্মপুকুরে হাতমুখ ধুতে গিয়ে স্বচ্ছ জলে
অদ্ভুত এক কদাকার মুখ দেখি...
স্বপ্নহীন চোখে তার ছায়ার ইশারা
জেগে থাকো গ্রহের সমস্ত পাপী
নিষিদ্ধ দুয়ার ভেঙে দাও, দূরে
তোমার ঘুম সব ছিটিয়ে দাও ঘাসে... বন্ধ্যা জমিন উর্বরতা খুঁজে পাক।

সারারাত মাদকের আসরে
প্রসূন ছেনে নেয়া দ্রবণেরা গড়িয়ে পড়ে
চকমকি কাগজের সামান্য শরীরের উপর।

আর কাউকে মনে করার দায়িত্ব নেই,
কাউকে পাওয়ার চিন্তাও বিবর্জিত থাকে, যেখানে সংরক্ষণের প্রশ্ন রয়েছে।
যেহেতু দূর থেকে নক্ষত্র দেখার মত করে ভাবালুতা পাওয়া
আমাদের প্রিয় ও শ্রেয় উপাখ্যান।
তাই নিজের ব্যক্তিগত গন্ধে বিমোহিত সেইসব প্রাণীরা
ঘুরতে বেড়িয়েছে অদেখা পৃথিবীর প্রস্তরময় প্রাণগৃহে।

আবারও আমি সন্তান হব ।
ফের খুঁজে নেব প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী উত্তাপ ।

এইসব মাদকের কাছে আমার যে যেসব সময় রয়েছে আলিঙ্গণে বিজড়িত,
তাদের কাছে আমি উইথড্রলের যন্ত্রণা চেয়েছি,
বিরহের উইথড্রল তো তারও অধিক,
তাকে তুমি কোন মাদকে করবে শান্ত?
কতটুকু পরিমাণ মনুষ্যসঙ্গ বা নিঃসঙ্গতা পেলে আমার নেশা হবে?
আমার তো ওভারডোজেও মৃত্যু ঘটে নি!
আমার তো ওভারডোজেও ক্লান্তি আসে নি!
—আমার ঘৃণা তবু উপেক্ষা করেছে কেবল একজন, সে হল সময় ।
তবুও পলাতক থাকে সে যখন, তখন তাকে ভাবি,
আর বাকি সময়টাতে দালির চিত্রকর্মের মত টেবিল বেয়ে বেয়ে
গড়িয়ে পড়ে একটা প্রাচীন ঘড়ি,
আমার ঘৃণা তবু উপেক্ষা করেছে কেবল একজন, সে হল সময় ।
অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত অজানুলম্বিত একটি সম্বোধন, সে হল সময় ।

—এবার আমি বসত করব আরো বহুদূর কোন পাহাড়চূড়ায়,
ঈশ্বরের নাগালেরও বাইরে কোথাও এক চূড়া আছে,
নিজস্ব সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে জেগে থাকব সারারাত,
জ্বলবে শুধু চোখের আগুন, ঘুমের উত্তাপ ।

দেবতার বাগান

প্রবেশ নিষেধ জেনেও পুঁজিবাদীদের ফুলের বাগানে যাই,
মোহমিতা কৃত্রিম ফুলেরা যেন সব
হিংস্র ছায়া করেছে প্রসব ।
আগুন জমিয়ে রাখে ছায়াসন্তানেরা...

দু'একটি মূষিক এসে পা শুঁকে যায়
আগুনের ছায়ায়—এই আগুনের ছায়ায়
জন্ম নেয় বেড়ালের চোখের মত আঁধারি রোদ!
হিম হয় মধ্যবিত্ত মন; আশ্বাস পেয়েছি তবু
দেয়ালে কাবা ও মানিপ্ল্যান্ট গাছ শোভা পায় দেখে ।

আজ বলি; কি দিয়েছে তারা, খাবার? নাকি খোঁয়ারের খবর?
ফুল ছেঁড়ার শব্দে জেগে ওঠে শ্রদ্ধেয় দেবতারা
আর আমি শাব্দিক নীরবতার পর শরীরী শব্দে কাতর হই খুব ।

খুনীর পুনর্বাসন, পলায়ন বা তিনটি মৃত প্রাণী

গুপ্তপথে পলায়নের সময়ে দেখেছি একজন মা তার শিশুকে রেখে পালিয়ে গেছে, একটি নতুন ঘর তার কাঁধের কাছে যে সব সবুজ কলাপাতার গাছ ছিল তাদেরকে নিয়ে সুষমভাবে পুড়ছে, আর একজন বিব্রত হাঁস ভাবছে সে কেন হল না শুভ্র ডানার অতিথি পাখি কিংবা বুনো কোন হাঁস।

আমার কাঁধে একটি মরা খরগোশ, একটি কাছিম ও একটা প্রাণী মানুষ, যার অপরাধ হল অস্বীকার করে যাওয়া, সমস্ত কৃত্রিম নিয়মাবলীকে। আমার অপরাধ ছিল উত্তর পথের লোকেদের হত্যার মত নিদারুণ গর্হিত কাজ! আমি যদিও খুব আনন্দের সাথেই খুন করে থাকি, যারা আমার সাথে একাত্ম হয়েছিল তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম ভিসুভিয়াসের জন্ম মানেই হল সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়া, বিধ্বংসী অগ্নি নিয়ে জ্বালামুখের সংকীর্ণতা নিয়ে নিজে নিজে ফুঁসে যাওয়া। আমার কাঁধের অত্যাচারিত মানুষটিকে দেখিয়ে দিলাম ফুলের গন্ধ কোন প্রকরণে সীমাবদ্ধ না থেকে নৈঃশব্দ্যে ঝরে গেছে বীজ। আমি নিভিয়ে দিলাম আমার রক্তাক্ত পদচিহ্ন কেউ যাতে অনুসরণ না করতে পারে, স্কাল্পহান্টারেরা আমাদের মাথা কেটে যদি রেখে দেয় পৃথিবীর জাদুঘরে ? দেখা গেল আমাদের বলা হচ্ছে মেধাবী মস্তিষ্ক এবং অর্থহীন নোবেলের মত বালছাল আরো অনেক উপাধি! যদিও কৃষ্ণপক্ষ এখন তবুও অন্ধকারেই রয়ে গেছে আমাদের যতশত মিথিক্যাল ভূত।

কয়েদকালে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক ধ্রুপদী আত্মার সঙ্গে। আমাকে দেখে হঠাৎ গেয়েছিল :

অন্ধ আনে ব্যাকরণ,
মিথ্যা মানে কিছুই নয়
জ্বলতে থাকুক আমার মন,
সত্য মানে কিছুই নয়,
পরিবর্তন, পরিবর্তন
আমার হাতে বিবি হরতন
তোমার হাতেও বিবি হরতন!
কেউ কি জানে জোচ্চুরিটা কোথায়?
শেষে শুধু এমনই হয়
নিজমুণ্ডু নিজেই কর্তন!

আকণ্ঠ কবিতা গিলে খায়, সে কবি ছিল, তার কাছে কবিতা মানে ভাববাদী আচরণ করা। প্রায়ই বলত সে কবিতার কোন মর্ম রাখতে চায় না, কবিতাকে কোন সীমানায় নিতেও চায় না সে। কোন মহান সত্তার কাছে সে বারবার মুক্তি চাইত দারুণ উত্তরাধুনিকভাবে। কেন যেন সে তার নিজের অসীম ভাবাপন্নতা ধারণ করতে পারত না, বরং নিদারুণ আধুনিক এবং বস্তুবাদী সেইসব কবিদের মত একদিন সে সুইসাইড করল। সুইসাইডের দিন তার তিক্ত বিষের বাটিতে আমি চিনি গুলতে গুলতে জানতে চাই যে তার কবিতাগুলোর কী হবে? সে আমাকে বলেছিল, পিঁপড়া হয়ে সেই অক্ষরগুলো পৃথিবীর কোথাও না কোথাও চলে যাবে। এরপর আমি সুমিষ্ট বিষপানে তাকে প্রলুব্ধ করলাম, আমার তৃতীয় খুন সম্পন্ন হল। গান গাইল সে :

আমার হাতে বিবি হরতন
তোমার হাতেও বিবি হরতন!
কেউ কি জানে জোচ্চুরিটা কোথায়?
শেষে শুধু এমনই হয়
নিজমুণ্ডু নিজেই কর্তন!

এর কিছুদিন পর আমি আমার প্রথম খুনের সুখস্মৃতি নিয়ে আত্মনির্বাসিতদের কয়েদ থেকে পালিয়ে এলাম, দেখলাম পথে কয়েকটি কলসের কাছে পড়ে আছে আমার খুব প্রিয় আয়না, একটা জলাশয়। দেখতে পেলাম আমার চুলদাড়ি অনেক বড় হয়ে গেছে, আহারে আমার সুশ্রী ও সুন্দর সামাজিক মুখ! ইচ্ছে হল আমি তাকেও খুন করে বাড়াই নতুন সেই আনন্দ।

পথে একটি অরণ্য পড়ল, ক্ষুধার্ত হলাম আমি। বড় বড় বুনো এক প্রকার মুলা দিয়ে আহার সারবো ভাবি। এমন সময় মুলালোভী এক খরগোশ এগিয়ে আসে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারণায় বন্য প্রাণীরা যেমন হয় এ আবার তেমন নয়, ভয় না পেয়ে সে আমার আশেপাশে নির্ভয়ে ঘুরঘুর করতে থাকে, আমি দ্বিতীয় খুন করলাম...

সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় একটি কাছিম চোখে পড়ে আমার, দেহে তার লেগে আছে শতবর্ষের পুরোনো শ্যাওলা। পুরোনোকে আকড়ে ধরে রাখার জন্যই যেন তার এই শক্ত খোলস আর অকারণে নিজ দেহেই পলায়ন! আমার রাগ হল। দেহাবরণের জন্য কচ্ছপটাকে মারতে কষ্ট হয়েছিল খুব।

একটি আগ্নেয়গিরির বৃত্তাকার জ্বালামুখ ধরে অসীম বছর হেঁটে চলেছে একটি জীবন্ত প্রাণী, কাঁধে তার তিনটি মৃত প্রাণী।

ভুল

নির্বাণ এসে চোখ নিয়ে যায় আমার,
পাপ শুধু মানুষের জন্য প্রযোজ্য,
তাই, ভুল বোঝাবুঝি আমার প্রিয় উপাখ্যান, জীবনের।
অথবা মৃত্যুই কি আমাদেরকে কোন কর্মে প্রবৃত্ত করে নি, কোনদিন?

যীশুকে ক্রুশকাঠে ঝোলাবার দিন আমি ছিলাম,
আমি নিজের হাতে সেই মহানের হাতে ঠুকেছি জং ধরা পেরেক,
উল্লাস, উল্লাস হোক চারদিকে...গ্যাংগ্রিন, গ্যাংগ্রিন!
পচে যাক হাত প্রতিদিন মরফিন, প্যাথেডিনের নতুন প্রবেশে।
যীশুকে আজও আমি দেখেছি মানুষ ঝুলিয়ে রেখেছে ক্রুশকাঠে, রাস্তায়।
রাস্তায় উৎসব
এক ঝাঁক নিরানন্দ মানুষের শরীরে পাপ থাকে না,
শুধু শোকগাঁথা নয়, সেই মিছিলে বিজয়ী ভাবও থাকে।

আহ্, গ্যাংগ্রিন... পচন।

নির্ভাবনা

শব্দের সঙ্গে মনোদৈহিক সম্পর্ক রয়েছে চিন্তাসমূহের,
অনেকটা যেন হাড় আর মাংসের সম্পর্কগাঁথা।
তবুও নীরব থেকে যখনই উচ্চারণ করি চিন্তার ভাষায়,
উচ্চারণগুলো কেন যেন চিৎকার হয়ে যায়। নৈঃশব্দ্যের আবছায়ায়।
নকশীকাঁথার মত ঊর্ণজাল বুনে চলি,
উচ্চারণমাত্র যা অর্থহীন হয়ে যায়!

মুক্তির চাইতে আপাত বক্তব্য নেই কোনো,
অথচ, কোনো দায়িত্বযুক্ত তত্ত্বের মাঝে, কবিতায় বাড়ে দায়।
অতি প্রাচীন যেন—পুরাতন।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের ঘুমের মত করে,
পৃথিবীর রোদে জল বয়ে গেলে,
পাঁচিলের শ্যাওলায় কাব্য ঘোরাফেরা করে...
এমন সময়ে একটি অকেজো মিসাইলে বসে বলে শিশু আফগান:
পৃথিবীর চোখে হিংস্র আমি—তুমি তো হে এমন নও!
তবে তুমি ভাবনার তীরন্দাজ হও।

আমি ভাবি নির্ভাবনায়।

অনাগত বিচ্ছেদ মূলতঃ প্রেতভয়

অতনু-কে

তোমার হাতের রেখায় নদী আছে,
সেই নদীতে প্রতিদিন ভেসে যাই আমি ।
কাটি না সাঁতার মরা মাছের মত ভেসে থাকি ।
জলে ভেসে থাকার বিদ্যা করে না কাজ,
জলপদ্মের ফাঁসে আটকে থাকি,
তুমি এসে পদ্মের সাথে আমাকেও তুলে নেবে এই আশায় ।

সারাদিন তোমার সঙ্গে থেকেও
সারারাত কেন মনে পড়ে যায় যে
তোমার চোখের কাজলরেখা রাত্রির বিস্তৃতি
করেছিল অতিক্রম । অতিক্রমণের প্রাক্কালে যে সমস্ত
ঝড় দিয়েছিলে উপহার, সেইসব ঝড় নিভিয়ে দিল
আমার ঘরের শেষ মোমের আলোটাকেও ।
আর আমিও বসে রইলাম অন্ধকারে ঘাড় ডুবিয়ে ।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় হয়
জানি, অনাগত বিচ্ছেদ মূলতঃ প্রেতভয়!

তোমার কণ্ঠ শুনতে পাই
ওদিকে অনাগত বিশ্বযুদ্ধের আগাম কামানধ্বনি!
আমি সেইসব কামানের কাছে বুক পেতে দিয়ে বললাম;
আমি প্রেমিক, আমি সেই প্রেমিক
যে কিনা তোমাকে নিয়ে যেতে পারে
এই যুদ্ধের বিশ্ব থেকে, অন্য কোথাও...

তোমার ইশারায় দেখতে পেলাম সেইসব ইচ্ছার গভীরতা ।

তাণ্ডব

এইখানে দেখি বৃক্ষেরা প্রাণভয়ে প্রণতি করে,
বাতাসেরা বুক ভরা প্রশ্বাসের মত নয়
বরং এতই দাপাদাপি করে; অপূর্ণতার বেদনায় ঝরে পড়ে ফল
ভাবি, এই তো নির্মল আবহাওয়া—যেখানে পাখিরা ভীত,
অভাগা কিছু পাখিরাও ফলের মত করে
ঝরে পড়ে অধোঃমুখে—তাদের ক্ষুদে চোখে, মৃত চোখে এখনও
রয়েছে আঁকা অকস্মাৎ মৃত্যুর অবিশ্বাস
যারা ঝরে পড়ে তারা সবাই আজ ভূমির স্থূল উর্বরতা!

আমিও আমার চোখ নিয়ে হতবাক, চোখ চেয়ে থাকে উর্দ্ধের উৎসাহে ।
আমার নিঃশ্বাস ঝড়ের মত প্রবল নয়
দীর্ঘ নিঃশ্বাস তবু কেন ঝড়ের মতই লাগে?
ভেতরে নড়ে ওঠে অরণ্য—শুকনো গাছে ঠোকাঠুকি হয়ে
জ্বলে ওঠে আগুন—অরণ্যে আগুন,
অরণ্যে প্রাণীদের প্রাণভয়—গাছেদের প্রণতি...

দাবানল! দাবানল তেড়ে আসে ভেতরে ভেতরে...
দেহের চির অন্ধকারে । ঝড়ের পিঠ থেকে অসাবধানতায়
ছিটকে পড়ে সহিস... এই সওয়ারী হল দুর্ভাগা সেই রোদ!
চির অন্ধকারে রোদ অট্টহাসি হাসে... এই বুঝি প্রকৃতির
আশ্বাস? বৃক্ষের প্রণতি মানে ভেঙে যাওয়া নয়!
সব শেষ হয়ে—শুরু হয়,

আমি চাই এই ঝড় নিয়ে আসুক সেই নিভে যাওয়া
দাবানল...
অন্তত একবার ।

আরশি আমাকে ভাঙে

আজ আমি আগামীকালের রূপকথা শুনেছি
মাঝ বরাবর ভেঙে যাওয়া এক আয়নার কাছে।
ভাঙনের ফলে এই প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসে বিভাজন!
সমমনা দু'টি মুখ, দু'জনেই দু'জনার প্রিয়জন।

জানি, পারদের কারণেই এই প্রতিফলন—এই প্রলেপ
হয়ত ছা'পোষা কোন কারিগর দিয়েছিল অতি সাধারণ কাঁচে
আমি তো দেখেছি এমন; যারা খুব কাছাকাছি বাঁচে
ঘুরে ফিরে খুব সুখ পায়, নিজেদের মুখ দেখে!

কারা এরা? স্থূল আত্মসুখবাদী? মুখোশের মুখশ্রী নিয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি!
সেই আয়নার কথা অনুযায়ী তারা রাজকন্যা নয়, উন্মাদ কিছু নারী,

কিন্তু আজ, রূপসীর সমরূপী বন্দিনী দেখো আয়নায়,
আমার তত্ত্ব হল বন্দিত্বের চাইতে মৃত্যুই ঢের ভাল,
তাই আমার ধনুক থেকে ছুটে যায় তীর রূপসীর বুক বরাবর...
ফলত আরশিটি ভেঙে যায়... এখন দ্বিভাজিত দর্পণ,
তুমিই বল, দু'টি রূপ তো দিলে অবলীলায়—
কিন্তু আমার বুকে কে ছুঁড়বে তীর?
আমি আক্ষেপে জড়োসরো... অপেক্ষমান...

চক্রান্ত

('তোমাকে মাতাল হতে হবে অবশ্যই তালে ঠিক থেকে'—সঞ্জীবন শিকদার)

জেগে থেকে এবং ঝরে গিয়ে, যেখানেই গিয়েছি আমি
সেখানেই অজস্র মৃতের শ্মশান আর জীবন্ত নগরী
করেছে ভিড়—উভয়ই উপকূল ভালবাসে; শুধুমাত্র
পার্থক্য এই, একটি নির্জন অপরটি লোকালয়; মুখোমুখি
হতে চেয়ে বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিরকাল!

বন্ধুবাৎসল্যে ম্রিয়মাণ সেই সব ঘুড়িরা সু-রসিকের মত
নিজেকে ছেড়ে দেয় লুটেরা বালকের হাতে...
যেন বা মৃৎকপোলে ফুটে ওঠে হাসি! আমাদের এ খরার সময়
সেই হাসি আজও সঞ্চয় হয়ে টিকে আছে। অন্ধ ভিখিরির
থালে তাই চোখদুটো ছুঁড়ে দেই খড়াশ শব্দ শোনার আশায়!
আশাহত হলেও উৎসাহের মৃত্যু ঘটে নি হে নিষ্ঠুর সময়,
সোৎসাহে দেখি, নাভির জ্বালামুখ চিরে মেঘবাষ্প উড়ে যায়,
ধায়! ঘুড়ির নগরে ধায়...

আয় নিয়ে আয় চাবুক বর্শা যত
পারলে শানিয়ে আনিস্ মেধা
লুকিয়ে রাখিস্ না ঘুমানোর ব্যাথা...
নখটি রেখে আঙুল ফেলে দিয়ে
বিয়ের বাদ্য... নাটক ঘটুক, ঘটুক সমাজ

সবাই এবং চাতক বলুক, আজ বৃষ্টি হল না গো!

আর যারা যারা কোলাহলপ্রিয় খুব, তারা ধূলির মাদুরে বসে করছিল হৈ চৈ। তাদের মাথার চারপাশে বোমারু বিমান উড়ছে বোমা নিয়ে, তারা তা জানেও না! বৈতালিক ছন্দে বোমারু বৈমানিক বিস্মিত হয়।

নির্লিপ্তভাবে বুনে চলি অর্থহীনতার আল্পনা।

বিকর্ষণ

ফলন্ত নারীর রূপ দেখে, চুম্বক পথের বিকর্ষণে ফিরে আসে
বিকর্ষিত কবি-কুমারেরা; আবারও ধন্য করে নিজ পূণ্যতায়,
পাপের রাতে সবাই নিজের পিতা খুঁজে পেয়েছে, পায় নি একজন, হায়!
পৃথিবীর কোন বালুঘড়ি নামিয়েছিল সেই সাধ, সেই বিরক্তির রাতে?
কোন রাতকানা জন্মরাত হয়ত তাকে করেছিল অপবাদে বুঁদ,
কবি প্রমাণের কালে হাঁটতে গিয়ে দেখে অনেকে; পিতার চুলে ছায়া, রোদ।
অনেক রোদ... দেখে না সে একা... করতলে সরে নি মাটি, আহ্ অরুন্তুদ!
জন্মদিনে আজ ক্রুশবিদ্ধ হবার ভয় নেই ভেবে পায় সে প্রবোধ।
কত মাস পর শিখে গিয়ে কোন ঋতুর পর
দ্বৈত-দু'জন হেঁটেছিল কলঙ্কিত জ্যোৎস্নার উপর?
ছায়ামূর্ত দম্পতি জৈবিক্লানঘরে মুঠোর জ্যোৎস্না শুদ্ধ করে
পাথুরে জমিতে ছেঁকে রেখে গিয়েছে জ্যোৎস্না শেষে কলঙ্কের পলি, প্রমোদ!
লোকালয় এই দশ মাস বালুঘড়ি দেখে দেখে কি বোকাই না বনে গেছে!

বিকর্ষিত কবিকুল শোন এবার—ক্রুশের যুগ হয়নি কি আজও শেষ?
কুমারেরা দেখো; লোকালয়ের আকাশে জলীয় প্রমুখেরা করেছে প্রবেশ,
এবার ভিজে যাও সকল জন্মের পাথুরে পথ, ভিজুক না জড় জলে।

ইন্টেলেকচুয়াল হাসির জন্য কবিতা কৌতুক

নৌকাডুবির ঘটনাকে জাহাজঘাটায় এভাবে বলতে নেই
দিতে হয় না মল্লার দোষ, তাতে মনোবৈকল্য দেখা দেয়,
ইচ্ছার করুণ মৃত্যু ঘটে—নৌকাডুবি হল,
তারপর কী হল তা তো জানো না
ঢেউয়ের মাথায় একদিন খুঁজে পেলাম দ্বীপ!
এই ঘটনার চাক্ষুষ দর্শক ছিল কাক—

সেও দেখছে হাড়টিতে লেগে ছিল মাংসের ছিটে-ফোঁটা
সেও জেনেছে প্রথম ঢেউটি ভাঙে লোকচক্ষুর আড়ালে...

আমিও জানি, আমার সমস্ত আলো ও অন্ধকার
দুটোই পরিধি পেয়েছে সম্পূর্ণ মনুষ্যবিহীন বলয়ে

বরঞ্চ তাতেও প্রমাণ হয় যেন,
মানবী ছিল না তাই আমরা সমকামী হলাম?
ব্যাথা ছিল না তাই, হলাম মর্ষকামী,
ঘোড়া দেখে এ সময় খোঁড়া হয়েছিল যারা
তাদের পৌনঃপুনিক মৃত্যু হতে লাগল...

জাহাজঘাটার সোডিয়াম আলোতে নয়
বরং একবার ভাবি, নিরাভরণ হয়ে তবে না হয় পাহাড়ের কাছে বলি?
কিন্তু নীল জোয়ারে দেখি সমুদ্রের ঢেউকে পাহাড়গুলো
আগলে আছে, একা নয়, বরং সারিবদ্ধভাবে ।

একইভাবে অস্থির ফেনায় লেগে আছে সূর্যাস্ত ।

কাকে বলি এই তপ্ত সুরের কথামালা ?

বরং সবকিছু শান্ত হোক ? পৃথিবী ভরুক স্থিরতায় ?
তখন বলে দেব, এই প্রবালদ্বীপে আমরাই করেছি প্রথম ঝাউবন ।

অন্ততঃ পৃষ্ঠা উল্টে গেলে কচ্ছপের কথা মনে হয় না !

এইসব রঙিন পৃষ্ঠাগুলো উল্টে গেলে কী থাকবে?
পৃথিবীর বিপরীতে তুলির ঝোপ বলল,
কিছু কি থাকবে আদৌ?
—এর অভাবিত উত্তর আমার অজানা ছিল,
অথচ হরিণের পৃষ্ঠদেশে সাদা বৃষ্টিরঙ দেখে এও বুঝেছি
শরীরে নোঙর করেছে শূন্যতার জাহাজ...
জানি, এ সমস্ত যৌক্তিক বিজ্ঞানের সূত্রমতে শেষমেষ
শূন্য রয়ে যায় শুধু—

কী থেকে যায়, নিরাময়ে?
কোন সুস্থতা নেই—নেই সমুদ্রের এমন কোন
নিঃসন্তান উপকূল, যেইখানে রাতে রাতে হঠাৎ
আশঙ্কার মত পালিয়ে যাবে মানুষের জীবনযাপন,
শুধু ঢেউয়ের আকণ্ঠ সুরে শোনা যাবে আমার
নন্দন কণিকার স্পন্দন–

উড়ে গেল আকাশ, উড়ে গেল
একটি উড়ন্ত পাখির পাশাপাশি, ডানাহীন চপলতায়
তখনই নির্ভুল হয়ে গেল তোমার ভবিষ্যৎ গণনা—

ফড়িংটি মেঝেতে পড়ে থাকবে চিৎ হয়ে,
তাই দেখে গোপনে বিদ্রুপের হাসি হাসবে টিউবলাইট
এবং চুপচাপ জ্বলতে থাকবে অভিজাত ঝাড়বাতি ।

পতঙ্গের মৃত্যুতে শোক হয় কি কখনো?
এক সভা সর্বজ্ঞ মানুষের ফিসফাস শুনি শুধু,
তারপর যাদুপ্রান্তরে দাঁড়িয়েও প্রথমতঃ আমার হাত, অতঃপর
সমস্ত অবয়ব দেখতে পাই আমি, তাই সমুদ্রের ঝাউ-নিঝুম তীরে বসে
বিজ্ঞান ও যাদু দুই-ই অস্বীকার করি অস্তিত্বের কাছে
কেননা মানুষের চোখে আমি পতঙ্গ ও রাজার মৃত্যু একই সময়ে দেখতে পাই...

এ সময় সমুদ্রবাতাস লোকালয় থেকে
এক সভা কথা নিয়ে আসে...
তবে রা...জা...র...মৃত্যু...কখন...ঘ...ট...বে...?

উত্তরও দিয়ে দেয় তারা, শরীরে যখন নোঙর করবে মৃদু বাতাস...
তখন শুধু যাদুকরেরাই বলতে পারবে,
সম্রাটের পাদুকা বিয়োগ সমুদ্রের কাছেই হবে...

আদিবাস

হে দিবসের আলোক,
তুমি তমোহর...
তোমার মৃত্যুতে শোক হয়, তবুও
তুমি তো অজর!
অজস্র জন্মগুলো ঝরে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছ তুমিও
বিবর্ণ পাতার মত...
মাঝে মধ্যে মনে হয় তুমি তো সবার মত নও,
কথার স্থলে সংগীত প্রকাশ কর,
আদিবাসী রমণীর মত তুমি
শাপলা পুকুরে করেছিলে স্নান,
সবুজ পাহাড় থেকে ধোঁয়া উড়ে যায়,
সেইখানে তোমার বসবাস ।
তুমি তো ক্ষুধার্ত আকাঙ্ক্ষায় ছিঁড়ে নাও নি
কোন লাল আপেল—নিষ্ঠুর কামড় দাও নি কোন...

এসব ভেবে ভেবে প্রার্থনায় ভুল করি,
ধ্যানে ভুল হয়ে যায়, আমাকে হারাই আমি...
এই নির্বাসিত আগুনে ভস্ম হয়ে যাব
এ তো চাই না আমি...
হঠাৎ বার্ধক্য ঘিরে ধরে যেন
বেঁচে থাকি যান্ত্রিক অলসতায় ।

দারুণ যন্ত্রণা হয়, যখন পাখি সব করে রব,
কিংবা সমুদ্রের বিশাল ঢেউ, ঝিনুক...এ সময়ে
হে আদিবাসী রমণী, তুমি নেশার
ঘোরের মত কী কারণে যে ঘিরে ধর!

চারিপাশে ধোঁয়া, অস্থি-কঙ্কাল হাতে কেন তুমি হঠাৎ!
কী বিভীষিকাময়, যেন ধরে আছে মারণাস্ত্র...
প্রবল সন্ধ্যা হয়,
প্রবাল নড়ে ওঠে হৃৎ গভীরে...
যা করার এখনই সম্পন্ন কর
মরণোত্তর কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই আমার,
সে সবই অতীত এখন!

তোমাকে চোরাবালি বলে মনে হয় যে ঘোরময়ী
যে আমাকে গ্রাস করেছিলে ধীরে ।

উত্তম পুরুষ

পিতার মত দুশ্চিন্তা নিয়ে বজ্রপাতে নিহত
হলেন সুউচ্চ মহীরুহ!
মহীরুহ জানতেন আজ রাত্রির পর যেসব
রোদ দখল নেবে তাঁর বিশাল ছায়ায়
সেই রোদের উত্তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে তাঁর
শিশু সন্তানেরা
কিন্তু মহীরুহ স্বয়ং জানলেন না যে
তাঁর মৃত্যু তাঁর সন্তানের জন্য বয়ে নিয়ে এলো
মুক্তির সেই রোদ!

রাজার সন্তান রাজার মতই অত্যাচারী হয়
ব্যতিক্রম কথা বলে কেবল রূপকথা!
আর হালখাতায় কবিতা লেখে কবি!
ঘুমন্ত কবির এক জোড়া চোখে রোদ এসে পড়ায়
চোখ মেলে তাকায় সে, অস্ফুটে বলে ওঠে:
শোষণের তরে শেকড় গভীরে পাঠায়
মৃত শাসকের কুল,
মুক্তির রোদে নেচে ওঠে ফ্যাকাশে সব ফুল!

ইঞ্জেকশান অ্যান্ড প্যুশিং

স্রেফ খোঁপার কারণে যদি ধারণ কর ফুল
তবে নিয়ে যাও আমার বাগানের সব ফুল...
সেইসব ফুলগুলো যখন তরলে রূপায়িত হয়ে প্রবেশ করে রক্তে,
ঠিক তখনই
হাতের যন্ত্রণায়, আমি থেকে যাই ভুল সময়ে
জগৎ যদি হয় ত্রিমাত্রিক, মাত্রা ও মূর্খতার যদি
হয় বন্ধুত্ব, তবে কি দুঃখবোধ হয়?
দুঃখিত নগর, আমি এখনও মেঘের জাহাজে
রঙের বৈচিত্র দেখছিলাম, জলবার্তা পাঠাই মেঘে
তখনই ফ্ল্যাশব্যাক...
বালক মনটি আমার বুঝত না
মেঘলা আকাশে ওড়াতাম ঘুড়ি
অথচ ঘুড়ি ভিজত না জলে ।

আমি চাই না সত্যি আমি চাই নি পোড়াজমি ।
লুব্ধ অরণ্য দেখতে চাই দূরে... অথচ দেখছি
পৃথিবীর ন্যাড়া মাথা ঘাসহীন এক মাঠ
গরু চরে না, চরে না গাভী
হে যন্ত্রণা, আমি এই ধ্বংস পাহাড়ে কোনও যৌক্তিক অন্ধকার চাই না

কী নিরাপদ ভাবনায় আমি ভীত হয়েছি আবার
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি, তখনই
হাতের চামড়ায় তুমি দেখেছিলে রক্ত...

গোলপাতার ছাউনি দেখে সভ্য মানুষেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল

গোলপাতা, আমার ছাউনির প্রয়োজন ছিল না
আমিও বারবার গৃহের চারকোণের অন্ধকারের কথাই ভেবেছি
আমার শার্টের আস্তিনে এখনও হত্যার খুন লেগে আছে...
শোনো গোলপাতা, আমি দাঁড়াতে পারব না
বর্ণান্ধ সেই প্রেমিকাটি আমার ফুলটি কালো ভেবে নিহত
আহত আমিও...

কার ভালবাসায় কে যে খুন হচ্ছে,
কার ক্ষত থেকে ঝুলন্ত প্রেম নিয়ে কে খুঁজেছে ছাউনি, জানো নি!
বোঝ নি যুদ্ধ কবেই শেষ হয়ে গেছে—ফুরিয়ে গিয়েছে ছাউনির বিশ্বাস
বরং বদলে হয়েছে ইটের ধারণা ।
মেয়েটিকে তার জন্মান্ধ বদ্যি ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে

গোলপাতা,
নিজের মৃদু সবুজ অংশে দেখিয়েছ তুমি আশ্রয়
পাতার সম্পূর্ণ সবুজ অংশ যেভাবে গাছ মেলে রাখো হায় উপরে!
একি অবাক এক আলোক প্রার্থনা!
গোলপাতা, কী দরকার এই সামাজিক অভয়ারণ্যের,
সামনে মরুভূমি খুলে যাচ্ছে
দেখতে পাচ্ছি ক্যাকটাস তার ফুলের জন্য মৌমাছি খুঁজছে
আমার কোন ছাউনির প্রয়োজন নেই ।

ভাল চেয়ে ভাল থাকা

একটি মানুষখেকো ফাঁদকে সারারাত পাহারা দিয়ে
শেষমেষ নিজেই পড়েছি ধরা...
ছায়া ছায়া চারিপাশ... স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল থেকে
উঁকি মারে সাপ আর তেলাপোকা, ভাবি
তারাও ফাঁদের অংশ কিনা,

নির্লিপ্তি ভর করে, নিরলস অপেক্ষায় ভেঙে পড়ি—
আশায় থাকি যদি কারও বাড়ানো হাতে দিতে পারি ভর;
যেন বা প্রেমিক হয়ে,
যেন বা শক্তিমান হয়েছি হেসে, অবশেষে
ভাবি, এর চাইতে ঢের ভাল হয়
যদি পাহাড়ে নামে ঢল আর
গহ্বর ভরে ওঠে জলে—
আবার ভেসে উঠি আমি ।

আততায়ী

আলিঙ্গনে অন্য কাউকে আহত করব ভেবে
পাঁজরের প্রতিটি হাড়ে হাড়ে দিয়েছি শান...
মনোবিকৃতির প্রবল আগ্রাসনে
পিছু পায়ে হটে যেতে যেতে
বিষাক্ত আর নভোনীল হয়ে গিয়ে
অন্যবাসরে আগন্তুক বনে যাই... ভীতি প্রদর্শন করি
জড়িয়ে ধরব বলে;
দেখি, মানুষ অযাচিত আলিঙ্গনে ভয় পেল ।
ঠিক যেমনটি পেয়েছিল হরিৎ সম্প্রদায়ের মাটি
এবং মেঘালয়; অর্থাৎ আকাশ!

এই যদি শেষবার, তবে
এসো সকল বন্ধুত্ব, প্রকৃতি কিংবা প্রেম
আহত হই সকলে...
সারিবদ্ধ হয়ে এসো ।

অসুস্থতা

বেদনাকে ভালবেসে জাগরণে আশ্রয় দিয়েছি যাকে
ঘোর ঘুমে সে কেন পরিত্যাক্ত আর হয়েছে অসহায়?
অজানা সাপটিকে নির্বিষ জেনেও দংশনের পর
সর্ববিষে বিয়োজিত হই! সভয়ে আঁকড়ে ধরি ল্যাম্পপোস্ট;
শীতল স্পর্শে আশ্বাস দেয় নগর : পৃথিবীর বৃত্ত ভেঙে
আবার এসেছে নিরাপদ অন্য সময়, বরং তুমি
পরিচ্ছদে লুকিয়ে ফেল নিজেকে...
গ্যাবার্ডিন আর পাল তোলা নৌকো আঁকা টি-শার্ট,
বরং এসো, সভ্যতার ছবি আঁকি নগ্ন হয়ে...
এ গরলে ডুবে থাকি; ঢের ভাল আছি
বিস্কিটে লবণ আর জিভে থার্মোমিটার নিয়ে
খুব বিহ্বল রোগী... প্রাচীরের সমান্তরাল হয়ে গিয়ে
আকাশের নিভু নিভু তারা দেখি; অলস ঈশ্বরের
অজস্র চোখ বলে ভ্রম হয়...
আর মনে হয়—
অলসের বেদনাই সৃষ্টির দারুণ উৎস্য ।

সাইকোপ্যাথ

দরজায় এসে কড়া নেড়ে গেল কেউ
অথচ দরজা খুলে কেন দেখি কেউ নেই?
ভিখিরি হয়ত হবে, নয়ত পুলিশের ফেউ,
অকারণে কে-ই বা এমন পাগলামি করে,
অপরাধী একা আমি পুড়ছি প্রবল জ্বরে
কানের কাছে একটা কুকুর করে ঘেউ ঘেউ
কানের একই পাশে মাছি ভনভন করে
একটি লাশ আর আমি শুধু, বাড়ি কেউ নেই ।

রক্ত মাখানো ছুরি, ঘরময় ভাঙা চুড়ি
পথ ভুলে ভালবেসে করেছি প্রেয়সী খুন;
দরজার কাছে কে রেখেছ ফুল, শুষ্ক আগুন!
ফুল মাড়িয়ে আমি ভালোয় ফিরেছি বাড়ি ।
দরজায় এসে কড়া নেড়ে গেল কেউ
অথচ দরজা খুলে কেন দেখি কেউ নেই?

কান্না

অন্ধকারে বেশ কিছু প্রাসাদের সাদা অবয়ব ধরা পড়ে,
বিপর্যস্ত রাজমহল—উদ্যানে খেলা করে রাজ-তনয়া!
সামান্য চোখে সে দেখে পাঁচিলের ওপাড়ে, আকাশে...
উড়ছে কিম্ভূত কিছু আলো—দিগন্ত চেরা রোদ, আবছায়া,
সেই রোদ যে সব আবছায়া করেছে দখল
সেখানেই চোখে পড়ে যুদ্ধের উৎসব
আকাশে আলো, আকাশে শকুন-মৃত্যুর প্রমাণ!

যুদ্ধের ময়দান থেকে মাইল ছয়েক দূরে
পাহাড়েরা করে আছে হাত ধরাধরি
সমুদ্রের জল বাধা পায় পাহাড়ের পাদদেশে ।
যে জল গড়িয়ে যেতে চায় যুদ্ধের আগুনে,
জলেরা ব্যর্থ থেকে যায় চিরকাল, আবদ্ধ তার জীবন;
তবুও প্রাসাদের বন্দিনী—তোমার চোখে কেন একই নোনাজল?
তা কি বদ্ধ রয়েছে শরীরে তার
কিংবা দৃষ্টির প্রতিবন্ধক ওই প্রাচীর?

আমার আক্ষেপ শুধু এই যে,
প্রাচীর পেরিয়ে তার দৃষ্টি দেখল না জলের আপসোস ।

দীর্ঘসূত্রিতা

দীর্ঘ রাতগুলো হল না সংক্ষেপ,

যেভাবে সকল বস্তু আগুনের কাছে গিয়ে
নিজেকে গুটিয়ে ফেলে—আমিও ভস্ম তেমন
দমকা হাওয়া এলে ঘটেছে যেমন ।
ভরহীন হয়ে উড়েছি অসাড়, অপ্রাণীবাচক
কিছু বস্তুর সম্বোধনে—কিছু ঘৃণা ফেরত পেয়ে
ফিরে আসি দেয়ালের কাছে—কেবলই ক্ষমা চাই
পেরিয়ে গিয়েছি বলে—যদিও ধ্বংসের কাছে
ক্ষমা চাইবার মত হয় নি কিছু
তবুও ধ্বংসস্তুপের বুকের উপর এক পা
তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসি...
শেষ হয় নি আবেগ—মুখে মিলিয়ে যায় নি হাসি,
গাছের শরীরে থাকা ওই নীড়ের পাখিদের মত
অস্থিরতায় ভাবি—
দীর্ঘ রাতগুলো আর হল না সংক্ষেপ ।

তোমার নামে হাসব একদিন, ঘনিষ্ঠ জানালায়

জন্ম থেকেই কতটা নীল তুমি পেয়েছ?

কতবার কত ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর পাশ দিয়ে
যাবার সময় তার ধ্যানটুকু ভেঙে দিয়েছ—তাও বা কে জানে?
অতিমানবেরা হয়ে গেছে সাধারণ...করুণা হয়, হাসায়!

তুমি বলা মাত্র নগর নিয়ে এল তার সকল সুদর্শন নাগর
সমুদ্রের বিভা না থাকলে বুঝি এমনটা হয়!
এভাবে হাবুডুবু সাঁতরে চলেছে তোমার দিকে মরুর সাঁতারুরা

আর জানালার খণ্ডদৃশ্যটি বন্ধ করে দিয়ে ভেবেছি
কী বোকা আমি! তা না হলে পুরুষত্বের এ কালো দ্বীপ নিয়ে
এখনও একা জেগে রইলাম!

আজ মহাসড়কে পা দিয়ে মনে হল এ কোন
এক মহাসমুদ্রে এসেছি
ডান দিকে পড়ে আছে মনোসরণির ভগ্নরূপ
বাম দিকে পড়ে আছে বিগত কথার লাশ ও উইঙ্কলের মগ্ন ঘুম!

বিরক্ত হয়ে উঠি বিরলে,
ভাবনায় মোমশিখা জ্বালালে,
বুঝি, কোন ডুমুরের ফুল আমাকে তার মৌমাছি বানাতে চায়!
বিরল পৃথিবী, আমি একা জেগে আছি...

অথচ সে ফিরে এলে মনে হয়
ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ এক লোকালয়।

স্রোত (খ)

গাছেরা হয়ে আছে অচেতন
তবুও কারা যেন জেগে থাকে বহু বছরের ঘুম বিসর্জন দিয়ে
জেগে থেকে জীবন যাপনের নীল কিংবা অন্য রঙের নকশা করছে
কোথায় তারা রয়েছে গোপন হয়ে—নতুন লক্ষ্য গড়ছে
উত্তাল কষ্টের পরিত্রাণ খুঁজে খুঁজে! তাদের খুঁজছি আমি,
এখন, এখানে, মাঠে জ্বালিয়েছি মোম...
এই অসামান্য আলোয় সংঘমিত্রা বল;
পাব কি খুঁজে কোথাও, কোথাও বহে নি পার্থিব বাতাস!
তবে সলতের আগুন কেন হয়েছে নিভু নিভু
বাতাসেরা লুকোচুরি খেলে—নিয়ে আসে ঝরাপাতা... বিস্মরণে...

এইসব ক্লান্তিতে নিরাময় নিয়ে এসো উত্তরের ঝড়, প্লিজ!
নিরাসক্ত ফুল কিংবা সুধাসক্ত কীটের জীবন আসলে
স্রোতের মত সাধারণ, কাব্যিক।
শুধু ব্যতিক্রম নেই কারো ক্লান্তির ভঙ্গিমায়।
আমার আর একটি পিঁপড়ের ক্লান্তিতে কোন
পার্থক্য নেই—
আমার ক্লান্তি হল লিপ্সার বুদ্‌বুদে বন্দি,
পিঁপড়া, তবে কি তুমিও...

আমার তো সন্দেহ হয়।

পাথরের আড়ালে সূর্যাস্ত লুকিয়ে আছে

অসুস্থ শৈবালের চাদর জড়িয়ে
ডাঙায় উঠে এল এক সামুদ্রিক পাথর...
নিতান্ত সাদামাটা শরীর; অস্থির উদ্ভিদ কি হয়েছে
তার কাজে সফল? ভেতরে পাথর নিয়ে তাই যেন
নড়ে উঠি জলের ভেতর, প্রাগৈতিহাসিক সময় জুড়ে
ছিল যেন অদ্ভুত অভিমান। ডুবন্ত হয়ে থেকে,
অন্ধকারে পুড়ে পুড়ে আমিও আঁধার হয়েছি আবার!

ওদিকে জলের জোয়ারে হাজারো নৌকা ডুবছে
আমার আশেপাশে পড়ে আছে সব... রঙিন মাছ
ছুটোছুটি করে ডুবন্ত নৌকোর নির্জন গলুইয়ের পাশ ঘিরে,
শুধু আমি আর এক অক্টোপাস বসে আছি হাত ধরে,
এই যে এ ফাঁদ রয়েছে আমাদের ভাবনার কলরোলে,
জলের ছাদের ব্যাপক সীমানা দৌড়ে পার
হয়ে যায় যেন সাদা কোন প্রেত...
হয়ত প্রেত হয়ত বা আলো; মৃদুমন্দ ঝড় অথবা দিন
অথবা শুধুই রাত-দিন!
হাত দুটো চোখের সামনে দূরবীনের মত করে ধরি,

দেখি, এ তো সেই পরিচিত চাঁদ ভেংচি কেটে গেল
এক সভা তারার মিছিল থেকে...
ধম্‌কে উঠি—চন্দ্র, তারা কিংবা কবির আবেগ
দূর হ তোরা! কোন গৃহস্থের খামার বাড়ির
শোভাবর্ধন কর্! নম্রনীলিমা যে ভাবে মেঘে মেঘে
বিদ্যুৎকে দিয়েছে আশ্রয়। আমি তো মৃত গাছটির
শেকড়ে দেই নি কোন প্রাণরস, জৈবিক তাড়নায় করেছি প্রস্রাব,
সবুজ গ্রহে যদিও সবুজ এভাবেই ধরে রাখা যায় নি কোনদিন,
কেননা, মূলতঃ মৃত্যুই কামনার যোগ্য!

সবুজাভ হয়েছে অরণ্য ও মনুষ্য সমাজ, আরও শত প্রাণীকুল,
উদিত সূর্যের বিপ্লব অস্ত্রে অস্ত্রে করে ঝকমক,
যেন আগুন ধরল বলে;
শুধু অন্তরে হয় নি কোন পরিবর্তন অথবা কালিমা লেপন!

পাথরটি ডাঙায় উঠে এলে বলি
জলের তলদেশ থেকে
কী নিয়ে এলে এতকাল পর?

একপাল মহিষ ও সূর্য, নিখাদ

বালুকাবেলা পার হয়ে সাঁতরে গেলে কিছু দূর,
মাছেদের নাকে-চোখে এসে কথা বলে জোয়ার,
চাঁদ তার নিজস্ব আকর্ষণী প্রতিভায় হেলে যেতে থাকে
তখনি জড়তার কথা বলে—মিটিমিটি দুলে ওঠে তারা...

কী এক অদ্ভুত ভাবনায় অকপট দুঃখবোধ কথা বলে
আমার যত চলাফেরা আর কতিপয় প্রাণহীন গাছের
গুঁড়িতে তখন আমি বিশ্রামরত, বসে ভাবি
কতই না চাঁদ ডুবে গেল স্তব্ধ উপবনের ঐ গম্ভীরতা পেরিয়ে...

কতক্ষণ ছুটে চলা তারা খসার সাথে কথা হয়
মহাকাল শুয়ে আছে এই কাশফুল, জলে,
তিনটি তারার মধ্যে গোলাপি মেঘের পর একটি
ত্রিভূজ লক্ষ্য করি; সযত্নে পাশ ফিরে শুই বালুকাবেলায়...

ঘুমিয়ে পড়ি, চোখের ভেতরে হাঁটে একপাল হরিণ
চুমুকে চুমুকে বুকে ভরে নিতে থাকে আদিম জীবন
আমি মোহগ্রস্থ হয়ে এগিয়ে যাই সে সময়—
দেখি, জলের যেইখানে হরিণের মুখ ছুঁয়েছিল,
সেই ক্রমবর্ধমান বৃত্ত দিয়ে একপাল বুনো মহিষ
বের হয়ে এলো... লম্বা শিঙের মধ্যে দিয়ে
বের হয়ে এল নিখাদ লাল সূর্য...

সেই আদিম মহিষ তাড়িয়ে বেড়ালো,
আর আমি জলের প্রান্ত ঘেঁষে ছুটে চললাম...

নির্জনতার মৃত্যু ঘটেছে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে

যখন ফিরল জ্ঞান, দেখি
মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে;
আর বাকি অর্ধেক ভেসে গেছে জলে
যাতে ভরা ছিল হৃদয়, কাম ও ক্ষুধা,
কারা এসে নিয়ে গেল?
এতই কি মূল্যবান এসব
নাকি হারিয়ে ফেলেছি নিজেরই অবহেলায় ?

যে মাঝি দেখালো জোয়ার, সে কি আজ অন্য দ্বীপে
বেরিয়েছে শিকারে—নাকি খুঁজছে চকমকি পাথর,
আগুন জ্বলবে তার ব্যক্তিগত দ্বীপে, আহ্! আগুন আগুন
ম্যানগ্রোভ বনের শুষ্ক শ্বাসমূল থেকে উড়ছে জ্বালামুখী ধূন!
সহজ সরল ঘাসেরা হয়ে আছে ফাঁদ... দেখেছি আমি,
শিকারী সেই ঘাসের পথ ধরেই গিয়েছিল!

পথিমধ্যে হরিণ মরে পড়ে আছে—সুন্দরী হরিণ
নিবৃত্তির পথে নৈতিকতার অসহ্য কাঁটা হয়ে রয়

সকল চক্ষুর আড়ালে পারি না কেন করতে এ পাপ,
নাকি অর্ধাংশ খুঁজে বেড়াই নিয়ত ?

খরা এবং বন্যা

সাগরকে আমি তোমাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে দিয়েছি
অচিরেই তোমরা খরা থেকে মুক্তি পাবে!
তোমার আত্মগত মূল্যবোধে যে সব কীটেদের বসবাস
খুব শূন্যতায় তারা আজ তোমাকে করবে ত্যাগ...
খুলির মোড়কে কিছু নোনাজল শুকিয়ে হবে লবণ,
খুব রোদে যখন বিপর্যস্ত হবে, তখন আলোর বিচ্ছুরণ
দেখতে পাবে... সংজ্ঞাহীনের নাকে ফুল ধরে রাখি
জলের প্রতি আক্রোশ তার, তাই সম্বিৎ পেয়ে
সে পালিয়ে যায় খরাময় প্রান্তরে...
সাগরকে আমি তোমাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে দিলাম!

প্রতিধ্বনির প্রয়োগিক নিয়ম

সময়ে সময়ে বজ্রপাত, পিছলে ওঠে পাহাড়ি পথ,
বাদুড়ের গুহা হতে কিছু আর্তনাদ গুমগুম করে,
পাহাড়ের চামড়ার নিচে পাহাড়ি ঝর্নার গতি আরো বেড়ে ওঠে
রক্তের মত করে। আমি হাত দুটো দূরবীনের মত গোল করে ধরি,
দেখি অদূরে আমার নিবাস, অদূরে নৈঃশব্দ্যের দেবতার অপেক্ষা,
পাহাড়ি ধ্বস! পাহাড়ি ধ্বস! আমাকে তলিয়ে যেতে হয় নিয়মানুযায়ী,
নিয়ম মানে না কেন বাতাস?
মেঠো বৃষ্টিই একমাত্র জানে শব্দ প্রকৌশল।

সমুদ্র বাতাস জানে খুন হতে কেমন লাগে—
কারণ কোন প্রতিধ্বনি আমি পাই নি খুঁজে সেখানের জলে,
স্রোতের প্রাচীর ও নীল জল আমাকে ভাবালুতা দান করে,
পাগলের ডাক্তারও সেই কথা বুঝে একদিন
তার সমস্ত জীবনের দেখা পাগলামি সাগরে করেছে দান।

সেইসব গভীর প্রতিধ্বনি আমি পাহাড়ে পাহাড়ে পেয়েছি,
ঝর্নায়, জোঁক যখন ধরেছে পায়ে তখন আমি বুঝতে পারি নি,
অনেকটা সুসময় নিয়ে চলে গেছে ভাঁড়ের চপলতা, কৈশোর ও
জোঁকের মত করে।

নৈঃশব্দ্যতা মানে শব্দবিহীনতা নয়,
নৈঃশব্দ্যের ডাকেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি
আমার ডাকে আমারই সাড়া দেয়া।

কেউ কি জানে, আমি কোথায়?

এখানে এসেছে ছবির আলো-ছায়া, বেড়েছে তরু
যেন বা কোন কবির কৃশ কায়া, হতোদ্যম হই
পথগুলো দেখে সাপের গতির কথা মনে আসে,
—এখানে পরাজয় মৃত্যুর মত সর্পিল
আমার ভয় হয়!

ঝর্নারও বুক পাথুরে হয়; আমিও তাই স্বাভাবিক
প্রকৃতির মত বুকে হেঁটে পেরোই জলের দেয়াল,
যেন নিজের খেয়ালেই খুব সাধারণ আমি আজ।

এখানে বেড়েছে বাতাস, এখানে ছবির ছায়া
এখানে কমতি নেই কোন
শুধু মনে অভাব তোমার—

কিছুকাল আগের দৃশ্যে চোখ দিয়ে দেখি;
তোমার মিলন জোয়ার,
তুমি তো মিথুন স্বভাব
তাই অপরাধী হয়ে প্রেমিক নিয়ে গেছে
তোমারই বিগত অন্ধকার—

আমার ভাত কবুতর নিয়ে গেছে ঠোঁটে,
তবুও অন্নলোভে আমি আর সেইসব উড়ালি পাখি
একই পাত্রে সেরেছি আহার।

কবি এবং তার গিটার

(এনড্রিস সেগোভিয়া-কে, সেবাস্টিয়ান বাখ—তোমাকে, কিন্তু আমাকে নয়,
রবিন ভাইকে, যে করেই হোক—ভুলবো তোমার শোক; নিলয় দাস)

প্রত্যাখ্যাত হতে হতে যে পথ সৃষ্টি হয় তা রহস্যময়তা নিয়ে আসে,
নিগূঢ় হারমোনির মত করে সংগীত নয়, যন্ত্রানুষঙ্গ বাজে মাথায় ।
রমণীর সরু কোমর জড়িয়ে ধরবার মত বেদনায় ফিরে আসি, 'গিটার'
তোমার কাছে সকল প্রতারণা শেষ করেই ফেরত আসি যান্ত্রিক গোলোযোগে,
কয়েকটা কর্ড আমাকে শেখায় নির্ভরতা, সমালোচনাবিহীন কিছু আঘাতে
আমি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠি...
তবুও সুর সপ্তমে চড়ে গেলে একটি তার ছিঁড়ে যেতে পারে,
এই আশংকায় আমার সারারাতই নির্ঘুম কেটে যায়,
সারারাত আমার পাঁচটি আঙুল বেঁধে রাখে ছয়টি তার ।

যখন সমুদ্রে ছিলাম, লোনাজল খেয়ে নিত সুর,
জং ধরা তারের শব্দ আমাকে আজও সাগরে নিক্ষিপ্ত করে,
আজ কোন তারে এতটুকু জং নেই
তবু নগরের এই জংশনে নেমে দেখি,
আমার হাতেই ধরে গেছে জং, লোহার মরিচা!

যে সুর নিঃশব্দে বেজে চলে প্রতিদিন
সে সুর সকল মানুষেরা শোনে আর পথ চলে,
আমরা আসলে নৈঃশব্দ্যের সেই সুর উদ্ধার করতেই
গানের মনোযোগি শ্রোতা হই, তবুও তাকে কি আর এভাবে পাওয়া যায়?

হাজার ভণিতা শেষ করে, লোকালয় হতে সুকৌশলে পলায়ন করে
আমি বাজিয়েছি সেই সুর...

একজন কবি জানে পত্র পতনের কেমন শব্দ হতে পারে,
পরিচিত মানুষ মৃত হলে পচনের যে শব্দ হয়
কবি সেই শব্দে পথে পথে থমকে যেতে পারে,
হাজার হাজার মাইল দূরের সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে
হয়ত কবি একদিন দেখল তার
পায়ের কাছে একটি ট্রেন হার্ডব্রেক করে থেমে আছে ।

শব্দ প্রকৌশলী হতে গিয়ে যে কবি ছয়টি হিমালয় ঘুরেছে
ঝড়ের নিঃশ্বাস তার ঘাড়ে লেগে আছে, নিশ্চয়ই ।
কোথাও বজ্রপাত! বজ্রপাত হল গিটারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যু
একটি তারের ছিঁড়ে যাওয়া অতঃপর পুনর্জন্ম ।

সেই কবি যখন আমাদের ভিড়ের এই নগরের
সবচাইতে লোক সমাগমের রাস্তার ধারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন,
রাস্তার সমস্ত শব্দশীল বাহন, এমনকি ভোক্সওয়াগন গাড়ির
আর্তনাদকেও থামিয়ে দিয়ে
শুনিয়েছিল কবিতায় গিটার ।

অপেক্ষা

আজ আমি অপেক্ষার প্রাসাদের সিংহদরজায় উপেক্ষিত হয়েছি—
সুগভীর পরিখায় ক্ষুধার্ত কুমির তাদের মৎস্যলোভী জিভ বের করে আছে।
জীবন তাদের সুদৃঢ় নিশ্চয়তায় হয়েছে মিশুক...
মৎস্যকুমারী যদিও তাদের রাজকন্যা পরিচিত
তবুও রক্তের লোভ কি আর সহোদরের প্রিয় ঘ্রাণ নয়?
প্রজনন কেবলই এক উদ্যমের মত,
সবশেষে ভালবাসা নয় হতাশা থেকে যায়,
পিছুটান... শিশ্নের দণ্ডিত আবেগ... জনক রূপে পতন!
জনকের কি জননীর কথা মনে পড়ে না যখন সে যুবক?

আমাদের প্রজনন আজকাল হয়েছে পণ্যের মোড়ক,
মহাজন ভাবে, প্রজনন করেছি বিপণন!
উদ্ভিন্নবসনা একটা রমণীকেই আমি দেখি
যখনই আমি যা কিছু কিনতে যাই,
তার সাথে সে নয় তবু তার প্রসাধন রূপ আমার সঙ্গী হয়!

একটা পাতা ঝরা দিনে যদি পেছনে তাকিয়ে দেখো,
দেখতে পাবে পেছনে শুধু বিশ্বাসের মায়াময় প্রতারণা
কবিতার প্রভাবনা
প্রতীকের মারপ্যাঁচ—

বুঝল না ছায়াভয়ে পরাক্রান্ত রোদ
কে যে তার আগমনে পালিয়েছে, আর কে রয়ে গেছে।
সন্ধ্যায় তো সূর্যাস্ত ঘটেই,
আমাদের চর্মচক্ষু অন্তত তাই দেখে বুঝে সুশান্ত সুশাসন।

বিচারকের সব রায়ই অপরাধীর বিপক্ষেই গিয়েছিল।
পৃথিবীতে বসতির অপরাধ আমার একার বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।
অনুতাপগুলো সোনালী আঁশে ভরে নিয়ে
সমস্ত মাছ ঝরে পরে তাদের পরিচিত সমুদ্রে ।

মৃত মাছ কাটে নি সাঁতার...
মৃত মাছকে কুমিরেও কাটে নি।

দূর থেকে কিংবদন্তী সেই রাজকন্যা নয় মৎস্যকন্যা,
আৎকে উঠে নিজের নিজেই মুখ চেপে ধরে শুধু,
কাছে আসে না।

হাতের আড়ালে

সূর্যের দিকে হাতের আড়াল নিয়ে তাকিয়ে প্রবালদ্বীপ চোখে পড়ে,
আরো যা আছে তা উদ্ভুক্কু দৃশ্যমান কিছু পাখি আর
স্যাটেলাইটের কিছু শব্দতরঙ্গ এসে আমার কান ভারি করে তোলে।
পায়ের কাছে বিষাক্ত প্রাণী সাপের প্রণামের মত ঢেউশীর্ষ অবনত হয়।
কিছু মাস্তুল দেখতে পাই অতি পুরাতন কালের ডুবে যাওয়া জাহাজের,
জলের অশান্ত উপরিতল থেকে নিজের উর্বর মস্তিষ্ক প্রদর্শন করছে যেন।
আমি এগিয়ে গিয়ে ভাসমান জলযানে নিখোঁজ হবার বাসনা রাখি,
পকেটের ছুরি বের করে মাস্তুলের কিছু শ্যাওলা চেঁছে নিয়ে উপকৃত হই।
দু'পায়ের গোড়ালিতে কেউ যেন মুঠি পাকায়,
দু'হাতে যেন বড়শির সূতা বাঁধা ছিল আর যেন তাতে টান পড়ল,
আমাকে নিয়ে সমুদ্রের কোন পরিকল্পনা আছে, তাই পায়ের কুণ্ডুলী আরো দৃঢ় হয়।
বড়শির শিকারীরা আমাকে ডাঙায় আর
অন্যদিকে সমুদ্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছার টানপোড়েনে
আমি নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাই,

এইসব রেশ হারালো যখন,
তখন আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম সবুজ জলে,
পৃথিবীর প্রাণের উদ্ভবের সেই প্রথম উপাদানটি
আমার হাতে কাকড়ার খোলস দিয়ে দেয়,
একটা তারামাছ মহাবিশ্বের নিভৃত স্থানের সন্ধান দিতে চায়।
আমি কিছু বলতে গিয়েও আমতা করি...

দেহের অধিকার পুনরায় ফিরে এলে
চোখে সূর্যের প্রখরতা বোধ হয়, হাতের আড়াল নিই ফের।

গোলক

একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ফিসফাস হচ্ছে ক্ষুধার্তদের,
সভাপতি ঝলসে যাচ্ছেন তার পালকবিহীন দেহ নিয়ে,
সকলেই কি তার নিজস্ব অভাববোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে
স্বার্থপর হয়ে যায়?হঠাৎ স্ফুলিঙ্গের মত ষড়যন্ত্র
ধরা পড়ে—দিগন্তের কাছে সীমানা ধার করে তারা,
পাথর বা জড় পদার্থের যৌনতার ধর্ম বুঝতে পেরে
তারা উৎপাদন করেছিল পত্রঝরা আগুন,
অশালীন ছায়াগুলো যে গুহার দেয়ালে প্রেতরূপ ধারণ করেছে
সে বিষয়টি সকলে বুঝেছিল আহার শেষে, তার আগে সেটি
ছিল শুধু ছায়াই—আর কিছু নয় ।

একটা জলাশয়ের চারপাশে হাটু গেড়ে মুখ নামিয়েছে তৃষ্ণায় আধমরা কিছু মরুযাত্রী ।
চতুষ্পদী সভাপতি পচে ভেসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা জলাশয়ে,
কে কবে এমন তৃষ্ণার্ত হয়েও জলের ময়লা দেখেছিল আড়চোখে?
জল তবু আকাশের জলাশয় থেকে যখন ঘুরে আসে দেহের কাছাকাছি,
আমরা তখন তাকে করপুটে ধরতে ব্যর্থ হই,
বদ্ধ জলাধারে হঠাৎ যে আলোড়ন তাকেও কি ঢেউ বলি?
এজন্য দায়ি যে সকল বাতাস তাদের আমি আজও দেখতে পারি নি,
সেসব ঢেউ আধমরা ওইসব মরুযাত্রীদের ঠোঁটে ধরা দেয় বিশেষ ক্ষণে,
আর সেসব ঢেউ বুঝি একটি মৃত সভাপতির দেহ থেকে উৎপন্ন!
তৃষ্ণা নিবারণের পর মৃতদেহ চোখে পড়ে—আর কিছু নয় ।

অন্ধকারের গোলকধাঁধায় ঘুরছে যে
পৃথিবীর শেষ প্রান্তের শেষ নিভুনিভু আগুনও এড়ায় নি তার চোখে
কিংবা
বৃষ্টির সামান্য উপক্রমও বুঝি চাতক দেখছিল আড়চোখে ।

শব্দশর

পাথরে জন্মেছিলাম—মাটির ক্লেদতার অনুভব কোনদিন বুঝিনি;
কেন যেন সেই ঘুমঘোরের বিনোদন চাইনি আমি এখনো,
চেয়েছিল বুঝি জীবনের ঘাম—জেগে থাকা প্রাণিজ প্রাণ;
ঠাণ্ডা চায়ের মত বিরক্তির শেষে শুনি টিকটিকির স্বর:
চৌদ্দ শিকের চৌহদ্দিতে আটকে আছে তার চেয়ে বেশি বছর!

আজ কাদায় জন্মানো মানুষের থাই দেখি; গ্যাবার্ডিন আছে, অক্সফোর্ড সু
এখানের এক পদ্মকে বলি, প্রেম নয় অভিকর্ষ আমার ভাই
বোঝো তো শুধু পতনের মানে! আমরা কিন্তু পাথর জন্মে যাই
শব্দহীন পৃথিবীতে জেগে জেগে সূর্যের জন্ম বহু গড়েছি
তাই সময়ের দেহের সাথে ছিন্নমস্তা সাদৃশ্য গড়ে ওঠে
ভাঙা মিনারে পচনশীল ফুল নয়—মন্ত্রের মত শব্দ চায়, শব্দ চাই...

বেঁচে তো আছি শব্দ, জন্মস্বর উচ্চারণ করেছিলাম ভেবে
জেগে থাকতে হয় আরও কিছু শব্দ বলার তাগিদে ।

আলোরাত—আলো অন্তর্যামী

জানো মৃতপথ; মানুষ কল্পনাকে নয়
আসলে কল্পনা জৈবিক মানুষকে প্রশ্রয় দেয় ।

পৃথিবীর নাসিকা নিঃসৃত রাতে হায়!
আঞ্চলিক গোধূলিরাও এভাবে থামে সন্ধ্যা প্রিয়তায় ।

ওরা তো ঘুমিয়ে, কিছু জানে না...

অন্য নগর তার নাগরিক বোধ ভর করেছিল বাদুড়ের নিশাচর ডানায়,
'কিছু করার নেই' ভেবে এক প্রহরী খুলে রেখে গেছে মরমের মোহমিতা দরজা ।
নিওরনের মাঝে একটি অচেনা মৃতপথ,
মানবীয় প্রতীক হতে ভিন্ন—অদ্ভুত এক চিন্তারঙিন পট ।

আহা! কেন যেন প্রকৃতি তার প্রাতঃকিশোরিনীর মতন ওড়নার ভাঁজ
খুলেই খেয়ালী হয়েছে আজ!
তাই দেখে ফেলি জীবন বৃদ্ধের ললাটের বলিরেখা: জানি সে শঠ
এখানে আরো এক মধ্যলোক—কালো ঘাসে আটকে আছে উদ্দেশ্য; থেমেছে প্রাণিজ সব জট
থেমেছে জীবন ও মৃত্যু—স্থির আছে সকল বৃত্তসুরেলা শকট ।

রোদ্দুর চৌকাঠ ঠেলে মৃত মহানেরা বেরোয়—যেন বিনিময় সাঁঝ
চায় তারা—চায় নি কোনদিন দ্বিত্ব বোধ; নারী পুরুষ দ্বিভাজন দুই প্রাণের
কালো ঘাসের চাবির মেলায় তারা খুঁজে বেড়ায় জলদ প্রেমের
নিজ নিজ অস্পৃশ্য চাবি স্বপ্ন সফরের!

শেষে কিছু দেখে ফিরি প্রোক্ত সোডিয়াম জ্যোৎস্নায় আজ ।
রঙ লুকিয়ে রাখা প্রজাপতি, জানি তুমি ঘুমন্ত মানুষের গন্ধ পাও মরমে ।
আর আমি তো কোন যুবক হব না—কেননা বিবাহের পর বালিশের দেয়াল ভেঙে
ক্লান্ত হয়ে পুরুষেরা পড়েছে ঘুমিয়ে, যেন করেছে কত কামকাজ !

মেধাবী ঘুমোতে জানে না—তবুও নিওরনে মৃতপথ মানচিত্র আঁকে ।
মিডাস করেছে তাড়া—হে মধ্যলোক বেঁচে থেকো দেহপ্রীত মন মাঝে ।

তলানী দেখি, ফিরে যাবার কালে

খুব হাসি পায়
যখন
গর্তে উঁকি দিয়ে দেখি তলদেশে ঠেকেছে জল ।
পৃথিবীর সমস্ত তলানী এসে ঠেকে চোখের কিনারে,
খুব গোপনে, সকলেই তার নিজস্ব সম্পদ আড়াল করে রাখে
অনেকটা জলের মত করেই,
গণতৃষ্ণার কালে কৃপণতা কারো দোষ নয় ।

তবুও কোন তৃষ্ণার্ত শকুন এসে গোপন চুমুকে
পান করে নেয় সেই সঞ্জীবনী স্রোত,
সেই শকুন কি জানে, জল ও পারদ উভয়েই যে
প্রতিবিম্ব ধারণ করে?

আমার অগোচরে যেসব আয়না ভেঙ্গে পড়ে
ব্যক্তিবহুল আস্তানায়; সেসব ঠুনকো পদার্থকে বলেছি:
তোমার আলো দৃশ্যমান করে না আমাকে,
কারণ গৃহে ফেরার আগেই গোপন অনেক প্রতিবিম্ব নিয়ে
পালিয়ে গেছে জীবনলোভী মানুষ সকল ।

মানুষ আসলে ঘুমিয়েই থাকে,
চেতনার পরিপূরক মৃত্যুর মত! জানালায় এসে ঠেকে
ধূপের ধোঁয়া; ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে বিপন্ন নাগরিক জীবন ।
ঘনায়িত হয় চায়ের কাপের উপরের মেঘের মত করে ।

গর্তের ভেতর ধূপের ধোঁয়া উঁকি দেয়, দেখে তলানী!
দেখে না বারুদ কিংবা আগুন,
তলানী দেখে বীতশ্রদ্ধ হয় শুধু,
সোডিয়াম আলো ধোঁয়ায় ঘনিয়ে আসে,
আমার বুক জ্বালা করে, ভাঙ্গনের সেবিকা এসে আমাকে
শোনায় পলায়নের উপকারিতা ।

নিজে নিজে নিভে আসে আগুন,
ভরপেট জল নিয়ে উড়ে যায় শকুনেরা,
প্রাকৃতিকভাবে গর্ত ভরে ওঠার অপেক্ষায় থাকে,
নিজ নিজ তৃষ্ণা নিয়ে, মগডালে ।

খুব কান্না পায় তখন ।

৩৪ হুইসেল বাজছে চোর পালাচ্ছে